উদভ্রান্ত প্রেম

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

——"with is writ is writ,
Would it were worthier."

Childe Harold's Pilgrimage.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

অষ্টবিংশ সংস্করণ

All rights reserved to Messrs, G. D. Chatterjea &

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম

সেই মুখখানি

সেই মুখখানি—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। মনে উঠিলে বুক ফাটিয়া যায়, মাথা ঘুরে, চক্ষুকর্ণ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ বাহির হয়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে—তবে কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। অপ্সরঃকণ্ঠগীতিবৎ, দূরাগত বীণাশব্দবৎ, নদী-হৃদয়ে স্ফুট চন্দ্রালোকে বিরহ-সঙ্গীতবৎ, সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুম-পরিমল-বাহী নিদাঘ সায়াহ্ন-সমীরণবৎ—ভাষায় তেমন কথা নাই, হৃদয়ের তেমন চিন্তা-শক্তি নাই, আমার এ স্বপ্নময়ী কল্পনায় তেমন কবিত্ব নাই, শ্রোতার তেমন সহৃদয়তা নাই, জগতে তাহার উপমাস্থল নাই—তেমন সুখশান্তি-সৌন্দর্য্য-পবিত্রতাপূর্ণ কিছু দেখিতে পাই না—হরি! হরি! কেমন করিয়া বুঝাইব, কেমন সেই মুখখানি। সেই মুখখানি—আর একবার দেখিতে পাই না? আর কিছু নয়, কেবল—দেখা—একবার চক্ষের দেখা দেখিব মাত্র, আর দেখিতে দেখিতে একবার কাঁদিব—ইহার মূল্য কত? যাহা লাগে, তাহাই দিব। একবার দেখা—

জন্মের শোধ একবার দেখা আর একবার কাঁদা, কাহারও ক্ষতি নাই, কাহারও অনিষ্ট নাই, কেহ কোন সুখে বঞ্চিত হইবে না, কেহ মনে ব্যথা পাইবে না, কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না—তবে আমি একবার দেখিতে পাই না ?

ভাল জিনিষের মূল্য অধিক, তাহা জানি। গরজ বুঝিয়া দাম হয়, তাহা জানি। এ বিশ্বকার্য্যের যদি কেহ কর্ত্তা থাক, তবে জিজ্ঞাসা করি, কি চাও ? সেই নিধি আর একবার দেখাইবার জন্য, কি চাও ? জীবন লও, অথবা তাহার অপেক্ষা যাহা ক্লেশকর—জীবন লইও না, জীবন লইও না—জীবনের সর্ব্বস্ব লও। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব লইবে ? শাপেই র : লও না—আশীর্ব্বাদ করিব—ধন্যবাদ দিব। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব কি ? মর্ম্মান্তিক যাতনা, স্মৃতি-বৃশ্চিকদংশন, সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য, সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য, ঈশ্বরে অবিশ্বাস—ইহাই আমার সর্ব্বস্ব—ইহা লইবে ? এ কি সুখের জীবন ? ঈশ্বরে অবিশ্বাস সে কি সুখের জীবন ? তোমারা আশা-ভরসা র— আমার আশা নাই। তোমরা স্বর্গে হোক্, নরকে হোক্ এক স্থানে থাকিবে ; আমি একেবারে চিরদিনের মতন বিলুপ্ত হইবে : তোমরা হয় ত বৈকুণ্ঠবাসী হইবে, আমি মাটী হইব। তোমরা এ সংসারে যাহা হারাইয়াছ, তাহা হয় ত আবার ফিরিয়া পাইবে ; আমার যাহা গিয়াছে তাহা চিরদিনের শোধ গিয়াছে : তোমরা সুখী হও, দুঃখী হও, জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে এক এক

জন, আমি আগন্তুক মাত্র—আজ আসিয়াছি, কাল চলিয়া যাইব। তোমরা অনন্তকালের সাক্ষী ; আমি জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র—এই উঠিয়াছি, এই মিলাইব। এক ধন ছিল, তাহা কেবল দিতে পারিতাম না। স্বর্গের জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, স্মৃতিলোপের জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, মনের কথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতার বিনিময়ে তাহা দিতে পারিতাম না, ইচ্ছামৃত্যুর পরিবর্ত্তে তাহা দিতে পারিতাম না—সে বিনিময়ের ধন নয়, সে বিলাইবার সামগ্রী নয়—তাহা হইলে দিতাম। তাহা ছিল—এখন নাই—কি জানি কোথায় গিয়াছে। হৃদয়-পিঞ্জরে একটি পাখী পুষিয়াছিলাম—কত যত্ন করিতাম, কত ভালবাসিতাম, কত মধুর বুলি বলিত, সেই সর্ব্বার্থসার পাখীটী, অকস্মাৎ এক দিন, থাকিতে থাকিতে শিকল কাটিয়া, কোথায় উড়িয়া গেল! তাহার জন্য সংসার খুঁজিয়া দেখিয়াছি—কোথাও মিলে না। যে দিকে তাকাই, তাহার অভাব মাত্র দেখিতে পাই। তাহার সন্ধানে কত ধর্ম্মপুস্তক, কত দর্শন-বিজ্ঞান খুঁজিলাম—কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারে না। কত ভালবাসিতাম, কত আদর করিতাম—মিথ্যা কথা! ভালবাসিতাম—এখনও ভালবাসি—যত দিন থাকিব তত দিন বাসিব, কিন্তু যত্ন-আদর কখনও করিতে পারি নাই। চিরকাল বলিব বলিব মনে করিয়া মনের কথা ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমি তাহাকে দেববালা বলিয়া জানিতাম,

কখনও ভাল করিয়া আদর করিতে পারি নাই—না জানি কি মনে করিবে, এই ভয়ে ভাল করিয়া সোহাগ করা হইল না। বুকে রাখিলে পাছে ব্যথা পায়, এই ভয়ে, সেই বিরহিনীর বিরহশ্বাস নির্ম্মিত দেহখানি, সেই শরতের জ্যোৎস্না-রচিত দেহখানি, কখনও বুকে করিতে সাহস পাই নাই। যখনই চাহিয়া দেখিয়াছি, তখনই বোধ হইয়াছে, সে মুখখানি যেন এ-জগতের নয়—যেখানে শোক-তাপ-দুঃখ আছে, যেখানে স্বার্থ-পরতা আছে, অপবিত্রতা আছে, পাপ আছে ও মুখখানি যেন সেখানকার নয়—যেন অন্য লোক হইতে কোন নষ্ট ধনের অন্বেষণ করিতে পথ ভুলিয়া এ পাপ-তাপপূর্ণ সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই কখনও আদর করা হইল না—মনে বড় খেদ রহিল, যে আদরের ধন, তাহাকে আদর করিতে পারিলাম না। আমার জীবনাবলম্বন, আমার জীবন-মরুভূমির একমাত্র সরসী, আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শুকতারা, আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় চলিয়া গেল? কোথায় গেল? কি হইল? মানুষ মরিয়া কি হয়? মাটী? সেই মুখ, সেই জগতে তেমন কিছু-নাই মুখ—হরি! হরি! হরি! কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিল সেই মুখ, জগৎ-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা-স্বরূপ সেই মুখ মাটী হইবে? তাহাতেই বলি, এ জগতে সুনিয়ম নাই, নিয়ন্তা নাই, বিধান নাই, ভালমন্দের বিচার নাই, পবিত্রতাপবিত্রতার তারতম্য নাই, দয়া-মায়া নাই, স্নেহ-মমতা নাই—কেবল নিষ্ঠুরতা, কেবল

নৃশংসতা, কেবল পরদুঃখপ্রিয়তা, কেবল পরসুখকাতরতা। কিন্তু কি বলিতেছিলাম, বলিতে বলিতে ভুলিয়া গেলাম।

সেই মুখখানি! বুকে আসিয়া বুক চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়ের মুখে কাপড় দিয়া ধরে, মর্ম্মকথা বলিতে দেয় না—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায়, প্রণয়ের প্রথমোচ্ছ্বাসের ন্যায়, সমাধিগত প্রাণের স্মৃতির ন্যায়, নিভৃতকুঞ্জে, সায়াহ্ন-সমীরণের নিশ্বাসের ন্যায়, বাল্যকালের সুখস্মৃতির ন্যায়, অকস্মাদুদ্ভূত বহুদিনবিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের ন্যায়, মৃদুনিনাদিনী ক্ষুদ্র-বীচিমালিনী জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে পৌর্ণমাসী রজনীতে মৃদুপবন-বিকম্পিত শারদ জ্যোৎস্নার ন্যায়, আমার ভূতপূর্ব্বের ন্যায় সেই মুখখানি। সেই মুখে, প্রেমভিক্ষা-পরিপূর্ণ সেই হাস্যময় দৃষ্টি, সেই ভীত অথচ পীযূষ-নিস্যন্দিনী দৃষ্টি, যে দৃষ্টি পলকে পলকে বলিত—আমি এ সংসার ভাল করিয়া চিনি না—আমি এ জগতের নই, আমাকে পায়ে ঠেলিও না; আর সেই হাসি—সেই, হাসিমাখা হাসি—হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ সেই হাসি; সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, তাহাতে সেই অতলস্পর্শ প্রেম—আ মরি মরি! এ সকল কেন সৃজিয়াছিলে জগদীশ! এখন তাহা মনে উঠিলে, কে যেন বুকের উপর পাষাণ চাপাইয়া দেয়। যেন কত নিষ্ফল বাসনার, অপূর্ণ সাধের, অতৃপ্ত তৃষ্ণার, নিহত আশার, সমাধিগত অনুরাগের, অধীর প্রেতনিবহ স্মৃতির অন্ধকার-গহ্বরে ব্যাকুলভাবে হা হা করিয়া

উঠে। সেই মুখ যে দিন প্রথমে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, এ রচনার অবশ্য রচয়িতা আছে, এ শিল্পের অবশ্য শিল্পী আছে—অন্ধ নিয়মের এ কাজ নয়; সেই দিন হইতে—আবার যে দিন সেই মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহ, সেই বাত্যাবিচ্ছিন্ন বাসন্তী-বল্লবী, সেই নিদাঘসন্তপ্ত কুসুম, সেই প্রভাতের মলিন শশাঙ্ক, আমার সেই উন্মূলিত আশালতা, কোলে করিয়া মনে করিয়াছিলাম, এ পরিদৃশ্যমান জগতে বিচার নাই, পরসুখ কামনা নাই—সেই দিন পর্য্যন্ত সকল কথা একেবারে বন্যার জলের ন্যায় মনে আসিয়া পড়ে, সুতরাং কোন কথাই মনে পড়ে না। তাহা তোমায় কে গড়িতে বলিয়াছিল? গড়িলে ত আবার ভাঙ্গিলে কেন? কেবল কি তোমার শিল্পকৌশল দেখাইবার জন্য? কেবল কি অধমকে পোড়াইবার জন্য? সে দিন, যে দিন আমি একা হইলাম—কেমন করিয়া বলিব, সে কেমন দিন! সেই দিন আমার জীবনের বিজয়া-দশমী। সেই দিন যাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা কি আর গড়িতে পার জগদীশ? একবার না, একবার জিজ্ঞাসা করিলে না, অনুমতির অপেক্ষা করিলে না, দুঃখীর মুখ তাকাইলে না—আপন ইচ্ছায় কাড়িয়া লইলে? বেশ করিয়াছ—তাহার জন্য দোষ দিই না—তোমার উপযুক্ত কাজই এই। তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি প্রভূতশক্তিমান, আমি দুর্ব্বল; এ পরিদৃশ্যমান জগতে তোমারই সব, আমার কেহই নাই; সুতরাং আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমার সংসারবন্ধন, আমার এ বাঙ্গালী

জন্মের একমাত্র দুর্গোৎসব, কাড়িয়া লইবে বৈ কি? ক্ষুদ্রকে যে না পীড়িল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? দুর্ব্বলের উপর যে অত্যাচার না করিল, তাহার শক্তি কোথায়? যে দীনহীন, যার কেহ নাই জুড়াইবার স্থান নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, ভালবাসিবার আর কিছু নাই, ভালবাসিতে আর কেহ নাই; ভবিষ্যৎ যার অন্ধকারময়, ভূতপূর্ব্ব যার অগ্নিময়, সুতরাং অন্ধকার অপেক্ষাও ভয়ানক; আর যার উপস্থিতে, আলোক অন্ধকার কিছুই নাই—কেবল উজ্জ্বল অন্ধকারে, কেবল তামস আলোকে দূরবস্থিত মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে; তাহাকে যে উৎপীড়িত না করিল, তাহাকে যে চরণে দলিত না করিল, তার কিসের মহত্ত্ব—সে কিসের বড়? করিবে বৈ কি! সিংহ বনের দুর্ব্বল পশু ধরিয়া খায়—সিংহ পশুরাজ। পাপ যবন আমাদিগকে নাজেহাল করিত—যবন দিল্লীশ্বর। আর তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সুতরাং আমাদিগকে পোড়াইবে বৈ কি! যে ছোট, অতি ছোট, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, তাহাকে যদি 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক না ডাকাইতে পারিলে, তবে তুমি রাজা কিসের? দুর্ব্বলকে চরণে দলিত করাই রাজধর্ম্ম; যে প্রতিকার করিতে পারিবে না, তাহার উপর অত্যাচার করাই রাজধর্ম্ম মানি—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম।

সেই মুখখানি! আমার বুকভরা ধন, বুক খালি করিয়া কে লইল রে! সংসারে এমন কে আছে যে, তাহাই দিয়া এ

শূন্য-হৃদয় পূর্ণ করিবে? সে শূন্য-হৃদয়ে অখিল-সংসার পূরিয়া দেখিয়াছি, সমগ্র মানবজাতিকে স্থান দিয়া দেখিয়াছি, যেন অনেক স্থান খালি পড়িয়া থাকে—আমার তবু যেন বোধ হয় কি যেন নাই। জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি যেন নাই। সেই ঘরবাড়ী, সেই বাল্যকালের বন্ধুগণ; লীলাময়ী জাহ্নবী তেমনই হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া চলিতেছে—সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীর ন্যায় মাটিতে পা পড়িতেছে না; আকাশে চাঁদ তেমনই হাসিয়া হাসিয়া পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিতেছে; তাহার তলে অতি ক্ষুদ্র পাখী তেমনই উড়িতেছে; বৌ-কথা-কও তেমনি আকাশভরা কণ্ঠমধু ছড়াইতেছে—সেই সব, কিন্তু আমি আর সেই নই—আমার তবু যেন বোধ হয়, কি যেন নাই। যে দিকে তাকাই, দেখি কি যেন নাই, মনে সে স্থিতি-স্থাপকতা নাই, সৌন্দর্য্যে সে রমণীয়তা নাই, গন্ধে সে মধুরতা নাই, সঙ্গীতে সে মোহ-কারিতা নাই, জগতে সে বৈচিত্র্য নাই, মনুষ্যমুখে সে দেবত্ব নাই; আর অন্তরে কি জানি, কি যেন নাই। কি নাই? আমার কি নাই?

সেই মুখখানি! এখন নাই—এক দিন ছিল, এখন নাই। সেই প্রেমে মাখা মুখখানি—সেই রমণীয়তা, কমনীয়তা, মধুরতা, পবিত্রতাময় মুখখানি—সেই অমরাবতী-সৌন্দর্য্যময় স্বর্গীয় মুখখানি—সেই কি-জানি-কেমন মুখখানি—যাহার সঙ্গে সঙ্গে

সব ফুরায়, সে মুখখানি কে হরিল? এ বিধানের কি বিধাতা নাই? এ নিয়মের কি নিয়ন্তা নাই? যদি থাকে ত সে অনন্ত শক্তিমান্ বটে; কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, বড় পাষাণ-হৃদয়, বড় কঠিনপ্রাণ! এ জড়জগৎ-শরীরে আত্মা আছে কি না, চিন্তা-শক্তি আছে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতীতি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। নাই কেন বলি শুনিবে? জগৎকারণকে নিষ্ঠুর কেন বলি শুনিবে?

জগৎসংসারে যে এমন কিছু আছে, এমন কিছু থাকিতে পারে, তাহা ত আমি জানিতাম না! কে জানাইবার জন্য বিধাতাকে মাথার দিব্য দিয়াছিল? কে জানিতে চাহিয়াছিল? তবে কেন জানাইলে? আমি যাহা চিনিতাম না, তাহা কেন আমাকে চিনাইলে? চিনাইলে ত রাখিতে দিলে না কেন? তুমিই দিলে, আবার তুমিই লইলে কেন? কাড়িয়া লইবে মনে ছিল ত দিলে কেন? দিলে ত আবার লইলে কেন? লইলে ত ভুলিতে দাও না কেন? যাহা কখন পাইব না, তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু যাইবে, এই কি তোমার ইচ্ছা? সে গিয়াছে, তার ভালবাসা গিয়াছে—আমার ভালবাসা যায় না কেন? চিরদিনের মত যাহাকে চক্ষের বাহির করিলে, তাহাকে অন্তরের বাহির কর না কেন? আমি ভুলিব মনে করি, ভুলিতে পারি না। সংসারের নিয়ম? সংসারের নিয়ম

আবার কি, আকাশ না পাতাল? তোমা ইচ্ছা বৈ ত নয়। মনে করিলেই সব করিতে পার। তবে সংসারে—শুধু আমি বলিয়া নয়, এ জগৎ-সংসারে এত দুঃখ কেন—কুসুমে কীট কেন—চন্দ্রে কলঙ্ক কেন—পুণ্য কর্কশ-মূর্ত্তি কেন—নরকের পথ কুসুমাস্তৃত কেন—সৌন্দর্য্য বিকৃত হয় কেন—মনুষ্যহৃদয়ে নৈরাশ্য কেন—মনুষ্যললাটে রোগ-শোক কেন—প্রণয়ে বিরহ কেন—আশায় অবিশ্বাস কেন—মনুষ্য স্বার্থপর কেন—পরের দুঃখ পর বুঝে না কেন—দুঃখ-প্রকাশের ভাষা নাই কেন—যাহা বুকের ভিতর হু হু করে, তাহা মুখে ফুটিতে পারে না কেন—স্নেহ আশঙ্কাপরায়ণ কেন—যে যাকে ভালবাসে সে তাহাকে হারায় কেন—হারায় যদি, তবে যে দিন হারায়, সেই দিন মরে না কেন—এ জড়জগৎ কেন—মাটীর দেহের ভিতর এ সুখ-দুঃখ সমাকুল, এ স্নেহবাৎসল্য-পরায়ণ, এ শান্তিসৌন্দর্য্য-পবিত্রতা-প্রিয় হৃদয় কেন—তাহাতেই বলি, যদি কেহ বিধাতা থাকে ত সে বড় নিষ্ঠুর। সে জীবের শুভ কামনা করে না, জীবের ভাল দেখিতে পারে না; সে পরের দুঃখ বুঝে না, সে কাহারও মুখ তাকায় না, সে পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে শুনে না—সে বড় নির্দ্দয়। সে জোর করিয়া খেলিতে বসাইয়া, আমোদ দেখিবার জন্য কিস্তির মুখে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়—মাত্ স্বীকার করিলেও নিরস্ত হয় না—খেলিব না বলিলেও ছাড়ে না। সে, কি জানি কেমন করিয়া, পাকা

গুটি কাঁচাইয়া দেয়। সে, কি জানি কেন, সাত-তুরুপে খেলায় ; রঙের একখানা সাতা মাত্র লইয়া খেলা হয় না—গত সুখের স্মৃতি-মাত্র লইয়া আর সংসার-খেলা খেলিতে পারি না। দুঃখের দিনে, সকল সুখ গত হইলে, সুখের কথা মনে পড়া বিড়ম্বনামাত্র। তাহাতেই বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই—তুমি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করিলে সুখের সংসার সৃজিতে পারিতে—তাহা কর নাই ; তাহাতেই বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। সংসারে কি সুখ নাই? তাহা কে বলিতেছে? সুখ আছে বলিয়াই ত বলি—এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই! সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হইলে, তাহাতে কাহার আপত্তি ছিল? তাহা হয় নাই, না হইয়া সুখদুঃখময় সংসার হইয়াছে বলিয়াই ত বলি—এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। এ সংসার অশ্রুজল দিয়া না গঠিয়া, হাসি দিয়া না গঠিয়া, যে হাসি-কান্নায় রচিয়াছ, তাহার জন্যই ত বলি—এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। কিন্তু কেমন ভোলা মন, আবার ভুলিয়া গেলাম, কি বলিতেছিলাম!

সেই মুখখানি! সান্ধ্যসমীরণ-হিল্লোলে বাসন্তীলতার দোলানির ন্যায় সেই মুখখানি—অপরিস্ফুট-বাক্, সংসার-শিক্ষাশূন্য, নিদ্রিত শিশুর পবিত্র অধরে সুখস্বপ্ন-জাত হাসির খেলার ন্যায় সেই মুখখানি, সেই কি জানি-কি-ময় মুখখানি—সেই বলিব-বলিব-মনে-করি-বলিতে-পারি-না মুখখানি—সেই

এই-আছে-এই-নাই, পলকে-পাই-পলকে-হারাই মুখখানি—সেই হৃদয়ে-আসে-মনে-আসে-না মুখখানি—সেই থাকিয়া-থাকিয়া-জাগিয়া-উঠে মুখখানি—সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না মুখখানি—হরি! হরি! কোন্ বিধাতা সে জন্মান্তরীণ সুখস্বপ্নময় মুখখানি গড়িয়াছিল? কি দিয়া গড়িয়াছিল? কেমন করিয়া গড়িয়াছিল? মনের কথা বলিতে পাই না কেন? বুকের ভিতর কি কুলকুল করে, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পাই না কেন? মনের কথা শুনাইবার জন্য মনের মত লোক পাই না কেন? কাহাকে বলিব? কে এ দুঃখের কাহিনী দুই দণ্ডকাল স্থির হইয়া শুনিবে? মানুষে কি আমার দুঃখ বুঝিবে? তাই অগ্রে বলিয়াছি ত, মনে বড় খেদ রহিল।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

জাহ্নবীতীরে

কুল্ কুল্ কুল্ কুল্—ও কি কথা মা? এই রব শুনিলে আমার হৃদয় যেন কেমন কেমন করিয়া উঠে, তাই জিজ্ঞাসা করি, ও কি কথা? উহার অর্থ নাই? তবে আমার বুকের ভিতর কি যেন কাঁপিয়া উঠে কেন? হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে কি জানি কি যেন দুলিয়া দুলিয়া উছলে কেন? উছলিয়া উছলিয়া দুলে কেন? ও সঙ্গীতের লয় আমার অন্তরে হয় কেন মা? বহুদিন-বিস্মৃত সুখস্বপ্ন সকল আবার অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে কেন মা? দেহের ভিতর প্রাণ, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়, কি-জানি-কিসের জন্য, ছট্‌ফট্ করে কেন মা? হৃত-সর্ব্বস্ব, দীনহীন, ধর্ম্ম জানেন কিসের কাঙ্গাল সন্তানকে বলিয়া দাও এমন হয় কেন মা?

উত্তর নাই—কেবল ঐ কুল্ কুল্ কুল্ কুল্! কিন্তু—বুঝিয়াছি—মরি মরি! তোমার ঐ কথার এত অর্থ মা? তাই বটে; হৃদয়ে যে কুল্ কুল্ শব্দ অনুভব করি, তাই কাণে শুনিতে পাই বলিয়া! দিবানিশি যে নৈরাশ্য-পরিপূর্ণ-কাতরস্বর হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে সান্ধ্যসমীরণের ন্যায় হায় হায় করিয়া বেড়ায়, তাই দুই দণ্ড কাল বসিয়া, শুনিয়া কর্ণ জুড়াইতে পাই বলিয়া!

যে শব্দ গায়ে ফুটে, বুকে উঠে, শোণিতে ছুটে। শব্দ গায়ে ফুটে! শব্দ চক্ষে দেখিতে পাই! ও আবার কি প্রহেলিকা? ওহো! হো! হাসিও পায় দুঃখও ধরে—আবার কুল্ কুল্ ধ্বনি! তাই বটে মা, এই সোজা কথা বুঝিতে পারে না, তা তোমার ও কুল্ কুলের অর্থ, ও কুল্ কুলের মহিমা কে বুঝিবে? কিন্তু যে বুঝিয়াছে—সে মজিয়াছে।

কিন্তু, ও কি রাগিণী মা? সাধাগলায় তুমি যে গাও—শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, তুমি যে গাও—দিন রাত তুমি যে গাও—যখন কেহ শুনে না, তখনও আপন মনে তুমি যে গাও—ও কি রাগিণী মা? ও কি দিব্য সঙ্গীত? স্বর্গের গান কি ঐ রকম? অমনি কাণভরা অমৃত কাণে ঢালিয়া দেয়—অমন বুকভরা মাধুরী বুকের ভিতর ঢালিয়া দেয়? তবে মা? একবার স্বর্গ দেখিব। দেখাবি মা? তুই পতিত-পাবনী—অধম সন্তানকে স্বর্গে লইয়া যাবি নে মা? বল্ মা—যাবি কি না, বল্ মা!

আবার ঐ কুল্ কুল্। তাই বটে মা—এই ত স্বর্গ—তাই বটে; কিন্তু আমায় ভোগালি না ত? না তাই বটে, মানিলাম ইহার অধিক আবার স্বর্গ কি? মাথার উপর ঐ চাঁদ, সম্মুখে এই তুমি, রজনী-সুন্দরীর মুখভরা এই হাসি, তোমার জলে নক্ষত্রদিগের এই নৃত্য, তোমার তীরস্থ লতার এই দোলানি, আর বায়ুর এই খেলা—বৃক্ষপত্রের সঙ্গে বায়ুর এই খেলা, পর-

রতা লতার সঙ্গে বায়ুর এই খেলা ; সেই নৃত্যায় তোমার ঐ রবের মতন ফুলগুলির সঙ্গে [illegible] এই খেলা—ইহার অধিক আবার স্বর্গ কি ?

কুল্ কুল্ কুল্ কুল্—তা মা, আমি আসি কেন ? কেন এ-গভীর নিশায় তোমার তীরে বসিয়া কাঁদিতে আসি ? আসি কেন শুন্‌বি মা ? তুই বৈ দুঃখের কাহিনী আর কেহ শুনিতে জানে না—এক কথা একশবার, কেহ শুনিতে জানে না। মনুষ্য আপন আপন শোকভার বহিতেই অক্ষম ; তাই মা, পরের দুঃখ শুনিতে কেহ ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিলে কেবল দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হয়, কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয় ; তাই মা, তোমার তীরসঞ্চারী বায়ুর সঙ্গে আমার দীর্ঘনিশ্বাস মিশাইতে আসি। পরের বেদনা, পর বুঝে না ; তাই মা, তোমার জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশাইতে আসি।

আর মা, এইখানে আমার এক জিনিষ হারাইয়াছে। ঐ যে সৈকত জ্যোৎস্নাশয্যায় নিদ্রিত রহিয়াছে, ওইখানে আমার এক সর্ব্বার্থসার রত্ন হারাইয়াছে। বুকের ভিতর, বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া, সে রত্নটি রাখিয়াছিলাম ; অকস্মাৎ একদিন ওইখানে কোথায় পড়িয়া গেল। তাই খুঁজিতে আসি, কিন্তু পাই না, তবু খুঁজিতে আসি—আমার অবোধ মন, আমার পাগল প্রাণ, মানে না। কত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি,

কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। বুঝিয়াও সে বুঝে না, তাহাকে বুঝাইব কেমন করিয়া ? কত দর্শন-বিজ্ঞান খুলিয়া, কত কাব্য-অলঙ্কার খুলিয়া, মনকে ব্যাপৃত রাখিতে যাই—অবাধ্য মন, মুখ ঘুরাইয়া বসে। তখন সেকালের সেই প্রেমলিপিগুলি খুলিয়া পড়িতে বসি ; কিন্তু জলে চক্ষু ভরিয়া উঠে, অক্ষর দেখিতে পাই না ! চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িতে যাই, আবার চক্ষু জলে ভরিয়া যায়—পড়িয়া সুখ হয় না। সে লিপিগুলি যে লিখিয়াছিল, সে ভাল লেখা পড়া জানিত না—কোথাও রচনাচাতুর্য্য নাই, ভাবপারিপাট্য নাই, শব্দবিন্যাস-কৌশল নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা আবার কিছুতেই নাই ; যাহাতে লোক মুগ্ধ হয়, তাহার কিছুই নাই, যাহাতে লোক বিরক্ত হয়, তাহার ঢের আছে—তবু, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের কবিত্ব, তাঁহার এক ছত্রের সমতুল্য নহে। সে লিপির প্রত্যেক ছত্রে প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক অক্ষরে, প্রত্যেক মাত্রায়, প্রত্যেক বর্ণচ্যুতিতে, প্রত্যেক ব্যাকরণাশুদ্ধিতে, প্রত্যেক ভ্রমে, প্রত্যেক মসি-বিন্দুতে যে কবিত্ব আছে, বীরাঙ্গনায় তাহা নাই, পলাশীর যুদ্ধে তাহা নাই, বৃত্রসংহারে তাহা নাই ; মেঘনাদ-বধে তাহা নাই, পদকল্পতরুতে তাহা নাই, উত্তররামচরিতে তাহা নাই, হ্যাম্‌লেটে তাহা নাই, ওথেলোতে তাহা নাই, ইলিয়াদে নাই, ইনিয়াদে নাই, কুমারসম্ভবে নাই, তাহা স্যাফোর সঙ্গীতে নাই, ভৈরবী-রাগিণীতে নাই, বসন্ত-পবনে নাই—তাহা অতুল !

পড়িতে পড়িতে এই সৈকত মনে জাগিয়া উঠে—মন উদাস হইয়া যায়। কেমন বংশীধ্বনিই যে কর্ণে লাগে, আর ঘরে থাকিতে পারি না। ছুটিয়া এইখানে আসি। আসিয়া জল খুঁজি, স্থল খুঁজি—কিন্তু খুঁজি মাত্র—যাহা খুঁজি, তাহা কৈ পাই না। তখন আবার গালে হাত দিয়া কাঁদিতে বসি।

রোদন করা কি দৌর্ব্বল্য? তবে মা, তুমি কুল্ কুল্ করিয়া কাঁদ কেন? তুমি দেববালা—তোমার আবার সুখদুঃখ কি মা? তবে মা, তুমি কি মনুষ্যের অনন্ত দুঃখে দুঃখিনী বলিয়া কাঁদ? তাই বটে; যে পরের জন্য কাঁদিতে জানে, যে পরের ব্যথা আপন হৃদয়ে অনুভব করে, যে পরের বিপদ্ আপন বলিয়া জ্ঞান করে, সেই দেবতা। মানুষে নিজের জন্য কাঁদে—দেবতারা পরের জন্য কাঁদেন। মনুষ্য যে দিন পরের জন্য কাঁদিতে শিখে সেই দিন তার দেবত্ব হয়। আর মা, যাহার কাছে এ আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা হয়, সেই দেবতা, পরহিতব্রতের উপদেশ যে দেয়, সেই দেবতা। ঈশা যখন বলিলেন, "অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও।" তখন বুঝিলাম, ঈশা মহাজ্ঞানী। সেই ঈশাই আমার যখন বলিলেন, "তোমার শত্রুকেও ভালবাসিও।" তখন জানিলাম, ঈশা দেবতা। এরূপ মহতী উক্তি যার মুখে সে ঈশ্বর-পুত্র বটে, দেবতা বটে, সে মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা বটে!

খৃষ্টের বহুকাল পূর্ব্বে, শাক্যসিংহ এই কথা বলিয়াছিলেন; * তাহাতেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। কোম্‌ত এই কথা বলিয়াছিলেন; কোম্‌তকে যদি কেহ দেবতা বলেন, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। আর মা, তুমি দিবারাত্রি পরের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছ; তাই মা তুমি পতিতপাবনী, তুমি অধমতারিণী, তুমি মৃত্যুঞ্জয়শিরোবিহারিণী। যিনি দেবাদিদেব—যাঁহার অঙ্গস্খলিত চিতাভস্মরজঃ মস্তকে করিয়া দেবতারাও কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার শিরে তুমি বৈ আর কিছু শোভা পায় না; কে না, তুমি অহোরাত্র পরের জন্য রোদন কর। পরের জন্য কাঁদিতে জান বলিয়াই তোমার জল স্পর্শ করিলে পাপক্ষয় হয়, তোমার জলে অবগাহন করিলে স্বর্গ হয়, তোমার তীরে মরিলে মুক্তি হয়। তোমার তীরে মরিলে যে মুক্তি হয়, তাতে কোন্ মূর্খ সন্দেহ করে? যে করে, সে তোমার পবিত্রতা বুঝে না, সে মূর্খ বৈ কি। তার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, সহানুভূতি নাই, পবিত্রতা নাই, ধর্ম্মবোধ নাই—সে চিনির বলদ। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয় ছিল, সর্ব্বতত্ত্বানুসন্ধায়িনী বুদ্ধি ছিল, সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভা ছিল, তাঁহারা

* M. Barthelemy Saint Hillaire following the example of Burhouf, Lassen and Wilson, fixes the year 543 B. C. as the date of Buddha's death; Max Muller places it in 477 A. C.

See Max Muller's *Chips from a German Workshop*.

তোমার কুল্ কুলের অর্থ বুঝিতেন। তাই পবিত্র হিন্দু-শাস্ত্রে তোমার এত মহিমাকীর্ত্তন। আমাদের বুদ্ধি নাই, তেমন লীলাময়ী কল্পনা নাই, তেমন সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা নাই, জড়জগতের সঙ্গে তেমন সহানুভূতি নাই, তেমন কিছুই নাই—আমরা হ্রস্বদীর্ঘ-বোধ বিবর্জ্জিত গণ্ডমূর্খ; তাই মা, তোমার পবিত্রতা, তোমার মহিমা, তোমার মাহাত্ম্য বুঝি না। তোমাকে দেখিলে আমি হাতে স্বর্গ পাই, আর তোমার তীরে মরিলে স্বর্গ হয় না? কিন্তু, কেমন ভোলা মন, কি যে বলিতে-ছিলাম, ভুলিয়া গেলাম।

একবার স্বর্গ দেখিব মা! স্বর্গের সুখের জন্য বলি না, কেন না, হৃদয়ের পরতে পরতে যার নরকানল জ্বলিতেছে, মনে যার সুখ নাই, তার স্বর্গেও সুখ নাই—স্বর্গের সুখের জন্য নহে, কেবল হারাণ ধনের অনুসন্ধানের জন্য। সংসার খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কোথাও পাই নাই, তাই একবার স্বর্গ খুঁজিব—একবার দেখিব, তেমন ফুল নন্দনকাননে ফুটে কি না। তোমার জল চন্দ্ররশ্মির নৃত্যের ন্যায় সুকুমার, নিদাঘ-সায়াহ্ন-গগনবৎ কোমল, প্রণয়িনীর প্রথম সপ্রেম আলিঙ্গনের ন্যায় সুখময়, পরদুঃখকাতর মানবহৃদয়ের ন্যায় পবিত্র, যে কুসুম এ অধমের গৃহকুঞ্জে ফুটিয়াছিল, দেখিব—তাহা দেবোদ্যানে ফুটে কি না। যে সাগরসেচিত অমূল্য রত্ন এ দরিদ্র-কুটীরে ছিল, দেখিব—তেমন রত্ন দেবরাজভবনে আছে কি না। যে সঙ্গীত, অতৃপ্ত-

হৃদয়ে দিবানিশি কর্ণে শুনিতাম—যে সঙ্গীত, এখন কেবল এই ঘুমে-ঢুলু-ঢুলু জ্যোৎস্নালোকে দেখিতেছি—যে সঙ্গীত, এই স্বপ্ন-মাখা মৃদুপবনে অনুভব করিতেছি, শুনিব—তেমন সঙ্গীত অমরাবতীতে আছে কি না। একদিন—হায়! কোথায় সেই দিন! একদিন যখনই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, সেই সঙ্গীত চক্ষের উপর ঝল্‌সিতেছে।* এখন সে দিন নাই; সে বীণা চিরদিনের মতন নীরব হইয়াছে, সে কণ্ঠ চিরদিনের মতন নীরব হইয়াছে—তবু সেই সঙ্গীতধ্বনি আজিও যেন কর্ণে বাজে—সেই সঙ্গীতের লয়টুকু আজিও হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীত দেখা কেমন? মনুষ্য-সৌন্দর্য্যে সঙ্গীত কি প্রকার? হরিবোল হরি! তবে মিছা বকিয়া মরিলাম। আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না; আমার এ হৃদয়দাহের পাগলামি তোমাদের ভাল লাগিবে না। আমার কথা কয়জন বুঝিবে! যে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের প্রাণকে ভাসাইয়া দিয়াও পাষাণে বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া আছে, সে বৈ আমার কথা আর কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রণয় কেবল স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সজীব থাকিতে পারে, সে বই আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রীতি, শাবকহীনা বিহঙ্গীর ন্যায় শ্মশানভূমির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে বৈ আমার কথা কয়জন বুঝিবে?

---

* "The mind, the music breathing from her face."
The Dide of Abydos.

যাহার প্রণয়দীপ নৈরাশ্যের নির্ব্বাত কন্দরেও নির্ব্বাণ হয় না, সে বৈ আমার কথা আর কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রণয়, নাস্তিকের মনেও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—তর্কযুক্তি পায়ে ঠেলিয়া, শরীর হইতে মনকে পৃথক করিয়া দিতে পারে, সে বৈ আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যে কবি না হইয়াও, সংসারের শোকতাপ, বিরহের যাতনায়, নৈরাশ্যের কাতরতায়, গতানুস্মরণের বিষের জ্বালায় কবি হইয়া উঠিয়াছে, সে বৈ আমার এ অসংবদ্ধ প্রলাপের অর্থবোধ কয়জন করিবে? কিন্তু—

আ মরি মরি! কি শোভাই ছড়াইতেছ মা—আ মরি মরি! একটি যেমন ক্ষুদ্রবীচি, তাহাকে ধরিয়া যাইতেছে, আর একটি তেমন ক্ষুদ্রবীচি, তাহাকে ধরিয়া ফিরাইবার জন্যই যেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে—পশ্চাতে অসংখ্য ক্ষুদ্রবীচি নিষ্কর্ম্মা লোকের ন্যায়, এ অভিমানের পরিণাম-রহস্য দেখিবার জন্য দল বাঁধিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকের মাথায় মাণিক জ্বলিতেছে। চন্দ্রদেব, নার্‌সিসদের ন্যায় আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া, একশবার তোমার স্বচ্ছ জলে মুখ দেখিতেছেন, আর হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন—আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন! এই ত সর্ব্বনাশের গোড়া, ওই ত সকল অনর্থের মূল মা! ওই ত আমায় কাঁদায়। উহার ওই গালভরা হাসি ওই মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়াই ত মরিতে ইচ্ছা করে। উহাকে দেখিলে আমার বুকের ভিতর কি-জানি-কি-যেন, কি-জানি কেমন কেমন করে।

ওই শশাঙ্ক স্নেহ-পরিপূর্ণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, নিষ্ঠুরতাময় আদরের সঙ্গে হৃদয় ভরিয়া যেন, অমৃতময় গরল, গরলময় অমৃত, ঢালিয়া দেয়। বহুদিনের নির্ব্বাণ অনল আবার যেন ধুঁয়াইয়া উঠে। তাহাতে দগ্ধহৃদয় আরও দগ্ধ হইয়া যায়, তবু যেন একটু সুখ হয়। যখন দুঃখের প্রবল পেষণে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে, তখন একটু কাঁদিতে পারিলে—কেহ দেখিতে নাই, কেহ শুনিতে নাই—নির্জ্জনে নির্ভয়ে ইচ্ছামত প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিলে যেমন সুখ হয়, তেমনি যেন একটু সুখ হয়। গভীর দুঃখের সঙ্গে একটু সুখ—শ্মশানে যেন ফুলের মালা, চিরনির্ব্বাসিতের কর্ণে যেন বাল্যসঙ্গীত, সুখাবসানে যেন সুখস্মৃতি, চিরবিরহীর যেন প্রিয়তমার প্রেম-লিপি—কি জানি কেমন একটু সুখ হয়। তাই চন্দ্রদেব! তোমাকে এত ভালবাসি। এত যে অত্যাচার কর, এত যে কাঁদাও, এত যে নাস্তানাবুদ খানেখারাব কর, তবু ঐ সুখটুকুর জন্য তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার ঐ কলঙ্ক যদি মুছিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আরও ভালবাসি। তাহা হইলে, তোমাকে দেখিলে যাহা মনে পড়ে, তাহার একটা মনবুঝান উপমাস্থল পাই। তাহা হইলে প্রতিদিন এই নিভৃত স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা তোমায় দেখি—যাহাকে আর কখনও দেখিতে পাইব না, তাহাকে অন্তরের ভিতর দেখিবার জন্য সর্ব্বদা তোমায় দেখি।

তা আমি এত কাঁদি কেন মা? কেন কাঁদিব? কি এমন মহাপাতক করিয়াছি, এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, কার পাকা ধানে মই দিয়াছি, কার সর্ব্বনাশ করিয়াছি যে, চিরদিন কাঁদিয়া মরিব? আমার অপরাধ কি মা? বিধাতা একজনকে সুন্দর করিয়াছিলেন, আর আমাকে সৌন্দর্য্যের ভিখারী করিয়াছিলেন, তাই মা আমায় দিনরাত কাঁদিতে হইবে? যাহাতে যাহাতে আমার অনুরাগ, যাহা যাহা আমার চক্ষে বড় সুন্দর, যাহা কিছু আমি ভালবাসি, সে সকল বিধাতা একাধারে মিলাইয়াছিলেন, আর বিধাতা আমাকে অন্ধ করেন নাই; তাই মা, আমি শ্রাবণের মেঘের ন্যায় নিরন্তর ঝুরিব?* বিধাতা যাহাকে সৌন্দর্য্যানুরাগী করিয়াছেন, সে সৌন্দর্য্যানুরাগী হইয়াছে বলিয়া—যাহাকে পবিত্রতাপ্রিয় করিয়াছেন, সে পবিত্রতা-প্রিয় হইয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া মরিবে? যে ভাল, তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া—যে আমাকে এই পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিল, তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া আমি কাঁদিয়া মরিব? কেন মা? আমার অপরাধ কি মা? সেই চাঁদমুখখানি যে গড়িয়াছিল, দোষ তাহার না আমার? এই ছার হৃদয় যে গড়িয়াছিল, দোষ তাহার না আমার? পরের

* "That thou were beautiful and I not blind.
Hath been the sin which shuts me from mankind."

—*The Lament of Tosso.*

অপরাধে পরের দণ্ড কেন মা? যে ভাল, তাহাকে ভালবাসা কি পাপ? তা ত নয়। বিধাতঃ! কোন্ মূর্খ তোমাকে জীব-মঙ্গলব্রতী বলে? কালসর্প এত সুন্দর করিয়াছিলে কেন? সর্ব্বনাশের আকৃতি এত মধুর করিয়াছিলে কেন?

কেন মা? জ্ঞানহীন অধম সন্তানকে বুঝাইয়ে দে মা, সংসারে এত অবিচার, এত নিষ্ঠুরতা কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—এ রচনার যে রচয়িতা, তিনি হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবকে দুঃখ দেন, নয় যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না—তিনি নিষ্ঠুর, নয়, অপূর্ণ। তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা না কর, বলিও না; কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার উপর এমন কিছু আছে, যাহার প্রভাবে তাঁহার ইচ্ছামাত্র কার্য্যে পরিণত হইতে পায় না। তিনি যে প্রভূত শক্তিমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন।*

সে যাহাই হউক, ইহা অবশ্য বুঝি যে, সংসার দুঃখময়। ইহা বুঝি যে, এই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধের ফল—দুঃখ। এ জগতের সঙ্গে যাহার সঙ্গতি হয়, তাহাই দুঃখময় হইয়া উঠে। সূর্য্যালোক পৃথিবীতে আসিবামাত্র ছায়াযুক্ত হয়। নিশারূপসীর কবরীভূষণ ঐ নক্ষত্ররাজি কেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট! কিন্তু উহার একটি খসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, অমনি লোকে

* See John Stuart Mill's Three Essays on Religion.

অমঙ্গল সম্ভাবনা করে। এ জগতের মৃত্তিকার সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়াই তোমাকে কুল্‌ কুল্‌ করিয়া কাঁদিতে হয়। সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমরা কাঁদি। রোদন করাই সংসারের নিয়ম, হাস্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। যে শূন্যচিত্ত, সেই হাসে; যে কিছু বুঝে না, সেই হাসে; যে অজ্ঞ, সেই হাসে—কেন না, অজ্ঞতা শান্তিপ্রদ; আর যে চিন্তাশীল, সেই দুঃখী; যে সংসার চিনে, সেই কাঁদে। আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করি—আর সেই দিন যে প্রস্রবণ খুলিয়াছে, তাহা আর ইহ-জন্মে শুকাইল না। অনেক সময় মনে করি, এ মনুষ্য-জন্ম কেন! কেহ বলিতে পারে না, কেন? আমার বোধ হয় কাঁদিবার জন্যই মনুষ্য-জন্ম।

তবে মা, রোদন করা কি দৌর্ব্বল্য? আমি যে এত কাঁদি আমি কি দুর্ব্বল? রোদন করা দৌর্ব্বল্য নহে কিন্তু আমি দুর্ব্বল বটি। দুর্য্যোধন শত্রু; তবু ভীম যখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিল, তখন যুধিষ্ঠির কাঁদিলেন—যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র। ঈশা মনুষ্যজাতির দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—ঈশা ঈশ্বরপুত্র। রামচন্দ্র, রাবণের জন্য কাঁদিয়াছিলেন—রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। শাক্যসিংহ মনুষ্যজাতির দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন, মনুষ্যের দুঃখ নিবারণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—রাজ্য ছাড়িয়া, মাতা-পিতা ছাড়িয়া, প্রণয়িনী স্ত্রী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন—শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব! পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ

লোক তাঁহার উপাসক।* তাই বলিয়াছি ত, রোদন করা দৌর্ব্বল্য নহে। যে কখনও কাঁদে নাই, সে নীচ। তবে আমি কাঁদি বলিয়া আমি দুর্ব্বল কেন? তাঁহাদের রোদনে আর আমার রোদনে প্রভেদ কি? প্রভেদ অনেক। তাঁহারা পরের জন্য রোদন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়; আমি আপনার জন্য কাঁদি, সুতরাং আমি ক্ষুদ্র, আমি দুর্ব্বল, আমি সামান্য। আমার রোদনে স্বার্থপরতা আছে, তাই আমি কাঁদিতে জানিয়াও দুর্ব্বল। আমার নিজের সুখের অবসান হইয়াছে বলিয়া আমি কাঁদি, তাই আমি দুর্ব্বল; আমার প্রণয় স্বার্থপর, তাই আমি দুর্ব্বল। সে গিয়াছে; সংসার—এ শোকতাপপূর্ণ সংসার—এ হাহাকারের সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে; সে জুড়াইয়াছে—চিরদিনের মতন, শান্তির উৎসঙ্গে স্বপ্নবিহীন-নিদ্রাভিভূত হইয়াছে—সে জুড়াইয়াছে, সে বাঁচিয়াছে, তার হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে! যেখানে সে গিয়াছে, সেখানে অত্যাচার নাই, বিপদ্ নাই, দুঃখ নাই, বিচ্ছেদ নাই; সেখানে সবই ভাল, সবই

---

* Berghaus in his Physical Atlas, gives the following division the human race according to religion :

Budhists—31.2 per cent	Brahmanists—45.4 per cent
Christians—30.7 ,,	Heathens—8.7
Mahamedans—15.7 ,,	Jews—9.3

Vide Max Muller's Chips from a German Workshop.

সুন্দর, সবই পবিত্র ; তবে আমি কাঁদি কেন ? আমার স্নেহ যদি বিশুদ্ধ হইত, আমি যদি আপনা ভুলিয়া ভালবাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুতে আমি সুখী না হই, দুঃখিতও হইতাম না। তাহা হই নাই, তাহার দৃষ্টান্ত দিবারাত্রি চক্ষের উপর দেখিয়াও আপনা ভুলিতে পারি নাই, তাই আমি সামান্য। যে পরের জন্য আপনাকে ভুলিতে পারে না, সেই দুর্ব্বল, সেই সামান্য, সেই ক্ষুদ্র। যে পারে, সেই মহৎ, সেই ধন্য, সেই প্রাতঃস্মরণীয়। আমি এ দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত করিতে চাই—পারি না যে মা ! মনে করি আর আপনার জন্য কাঁদিব, না—পোড়া মন মানে না যে মা ! মনে করি মনুষ্যজাতিকে হৃদয়ে স্থান দিব; মনুষ্যজাতির জন্য, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের জন্য, আপনাকে ভুলিয়া যাইব—ততদূর প্রশস্তচিত্ততা নাই যে মা !

কুল্ কুল্ কুল্ কুল্—তুমি এই গীত গাইতেছ। বায়ু, কি বলিয়া বলিয়া তোমার তীরে তীরে ঘুরিতেছে। তীরস্থ বৃক্ষরাজি শাখা-হস্ত নাড়িয়া মস্তক দোলাইয়া কি বলিতেছে। তদবলম্বিনী বল্লরী থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সকলেরই কি ভাষা আছে মা ? আছে বৈ কি। আমাদের সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা নাই বলিয়া, আমরা তাহা বুঝি না। কিন্তু আমি আজি বুঝিতেছি। তোমার সলিল-শীকরবাহি-সমীরণস্পর্শে দিব্যকর্ণ পাইয়াছি। তোমার তীরে সৈকতাসনে বসিয়া দিব্যজ্ঞান পাইয়াছি, তাই আজ স্থাবর-জঙ্গমের কথা বুঝিতেছি। লতা

বলিতেছে—দেখ, অনন্ত নীল বিস্তৃতিমধ্যে ঐ সুন্দর চাঁদ, পুণ্যসলিলা এই জাহ্নবী, দক্ষিণ-মারুতের এই হিল্লোল—আমি সুখী, তাই দুলিতেছি; কেন না, যে সুখী, সেই চঞ্চল, সেই অস্থির! বায়ু বলিতেছে—দেখ, কি রাজোদ্যানে, কি দুর্গম অরণ্যে, যেখানে যে ফুলটি ফুটে, তাহার সুগন্ধ আমি তোমাদের জন্য বহন করিয়া বেড়াই—আমার কোনও লাভ নাই, তবু পরের বোঝা মাথায় বহিয়া বেড়াই—যে না লইতে আইসে, তার ঘরে গিয়া দিয়া আসি—অতএব নিঃস্বার্থ পরহিত ব্রতই পরম ধর্ম্ম। বৃক্ষ বলিতেছে—দেখ, যে আমাকে ছেদন করিতে আইসে, তাহাকেও ছায়াদানে আমি বিমুখ নহি—অতএব শত্রুকে স্নেহ করাই প্রকৃত মহত্ত্ব। যে মিত্র, তাহাকে কে না ভালবাসে? আর মা, তুমি বলিতেছ—দেখ, আমি দেবী; আমার নিজের সুখ-দুঃখ নাই—কেবল তোমাদের জন্য কাঁদি, কেন না তোমা-দিগকে আমি ভালবাসি এবং যে ভালবাসে, সেই কাঁদে। কিন্তু আমার রোদনের পরিণাম আছে। আমি স্নেহ ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়া অবশেষে অনন্ত-সাগরে মিশাই; তখনও যে আমি—সেই আমিই থাকি, তোমাদের জন্য যে অপার স্নেহ, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে, কেবল স্নেহজনিত রোদন থাকে না—কেবল কুল্ কুল্ থাকে না—অতএব স্নেহকে অনন্ত বিস্তৃতি-গত করাই পরম পুরুষার্থ। সমগ্র মানব-জাতিকে স্নেহ করাই স্নেহের প্রকৃত সুখ, কেন না, এ প্রণয়ে বিরহ নাই—একজন গিয়াছে;

সেই শূন্য সিংহাসনে যদি কাহাকেও স্থান দিই, সেও যাইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজাতি ত কখনও যাইবে না—ব্যক্তিবিশেষ মরিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজাতি ত কখনও মরিবে না। যদিই যায়—আমাকে ত তাহা দেখিতে হইবে না! তাই বলিতেছিলাম, এ প্রণয়ে বিরহ নাই। তাই বটে; আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমি দুঃখী। যদি সমগ্র মানবজাতিকে, অথবা সমগ্র ভারতবর্ষকে, অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গদেশকে হৃদয়ে স্থান দিতাম, তাহা হইলে এত কাঁদিতে হইত না—স্নেহজনিত সুখ থাকিত, অথচ স্নেহজনিত দুঃখ থাকিত না। বুঝিলাম মা, তুমি পতিতপাবনী বট, তুমি অধম-তারিণী বট, তোমাকে স্পর্শ করিলে পবিত্রতা জন্মে, তোমার তীরে বাস করিলে মুক্তি হয়। যে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে চায়, সে যেন তোমার নিকটে আইসে; যে জ্ঞান লাভ করিতে চায়, সে যেন তোমার নিকটে আইসে; যে সুখের ভিখারী, সে যেন তোমার নিকটে আইসে। তুমি সর্ব্বসুখ-প্রদায়িনী, সর্ব্বার্থসাধিকা—তবে, আমায় এক ভিক্ষা দে মা! যদি আর কখনও মনুষ্যজন্ম হয়, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি আবার মনুষ্যজন্ম হয়, তবে যেন তোমার তীরে জন্মগ্রহণ করি—রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা তোমার তীরে কীটাণুকীট হওয়া ভাল। কিন্তু শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া আজিকার মত বিদায় হই মা—বড় ঘুম পাইতেছে।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রাণের ব্যবসায়

একটা প্রাণের ব্যবসায় করিলে হয় না? সকল জিনিসের ব্যবসায় হয়, প্রাণের ব্যবসায় হয় না? কখনও ব্যবসায়-বাণিজ্য শিখিলাম না—এ পাপ বাঙ্গালী জন্ম পবিত্র হইবে কেমন করিয়া? আজকাল অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে, ব্যবসায় না করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধার হইবে না। বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না কেন? প্রাচীন ভারত বড় হইয়াছিল কেমন করিয়া? প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য একেবারে ছিল না বলিতেছি না—বড় কম। প্রাচীন রোম উন্নত হইল কেমন করিয়া? মুসলমানেরা বড় হইল কেমন করিয়া? তা নয়; কোনও একটা বিষয় প্রধান লক্ষ্য হইয়া থাকিলেই হইল। তোমার আমার লক্ষ্য হইলেই হইল তাহা নয়; তোমার আমার লক্ষ্য না হইলেই হইল না, তাহাও নহে—জাতীয় লক্ষ্য হইয়া থাকিলেই হইল। ইহাতে তুমি আমি বাদ থাকিতেও পারি। ব্যবসায়েও যেমন, ইহাতেও তেমনি বাণিজ্যপ্রধান দেশে বাণিজ্য কিছু সকলেই করে না। ভারত বড় হইয়াছিল, জ্ঞান এবং ধর্ম্ম প্রধান লক্ষ্য করিয়া। তাই বলিয়া, প্রাচীন ভারতে মূর্খ ছিল না, অধার্ম্মিক ছিল না, এমন নহে। কিন্তু বড় হইলে ত আরও বড় হইল না কেন? উজ্জ্বল প্রভাতের পর উজ্জ্বলতর মধ্যাহ্ন দেখা গেল না কেন?

প্রাতঃসূর্য্য প্রাতেই অস্তমিত হইল কেন? জাতিভেদ ছিল বলিয়া। জ্ঞান ব্রাহ্মণেরা একচেটে করিল—জাতীয় লক্ষ্য হইতে পাইল না। ব্রাহ্মণেরা বড় হইলেন, ভারত অধঃপাতে গেল। যতদিন সম্প্রদায় উঠিয়া না যাইতেছে, যতদিন সমগ্র ভারতসন্তান একসম্প্রদায় না হইতেছে, তত দিন ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। রোম বড় হইয়াছিল, আধিপত্য লক্ষ্য করিয়া। মুসলমানেরা বড় হইয়াছিল, ধর্ম্মপ্রচার লক্ষ্য করিয়া। কার্থেজ বড় হইয়াছিল, ইংলণ্ড বড় হইয়াছিল, টাকা লক্ষ্য করিয়া। ভারতের যাহা দেখ, তাহাতেই দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম্মভাব দেখিতে পাইবে। প্রত্যেক হিন্দুরমণী, মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা-পারম্পর্য্য সমালোচনা করিতে সক্ষম। প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকে, দিন দেখিয়া বাটীর বাহির হইতে হয়, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনিতে দিন দেখিতে হয়, আহারের পূর্ব্বে এবং আহারের সঙ্গে দেবারাধনা করিতে হয়; চিঠিই লিখি, আর দোকানের জমাখরচই লিখি, প্রথমে আরাধ্য দেবতার নাম লিখিতে হয়; শয়ন করিবার সময় ঈশ্বরের নাম করিয়া শয়ন করিতে হয়। বিছানা হইতে উঠিবার সময় ঈশ্বরের নাম করিয়া উঠিতে হয়; দেবতার নামে সন্তানের নাম রাখি; গৌরীদানের ফল হইবে বলিয়া অপরিণতবয়স্কা কন্যাকে অযথা বিবাহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিই। রোমের যাহা দেখ, তাহাতেই তরবারি-ফলক এবং রুধিরধারা রহিয়াছে। ইংলণ্ডের অস্থি-মজ্জাগত, শেল-ল্যাক্ এবং ল্যাক্‌ডাই। আমরা ইংরাজের শিষ্য,

সুতরাং টাকা লক্ষ্য করিয়াই বড় হইতে চাই, টাকাকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিতে চাই। কেন, আর কি লক্ষ্য নাই? যদি বল, এখন আর সেদিন নাই—ইংরেজ ব্যবসায়ী, ইংরেজ বড়; আমরা ব্যবসায়ী নহি, আমরা ছোট। তাহার উত্তর আছে। ইংরেজ-বাণিজ্যের ন্যায় কাহারও বাণিজ্য নহে—ইংরেজ সর্ব্বপ্রধান নয় কেন? জর্ম্মণির বাণিজ্য ইংলণ্ডের অপেক্ষা ন্যূন, তবে জর্ম্মণি ইংলণ্ডের অপেক্ষা বড় কেন? ইহার কারণ ইংলণ্ডের যে পরিমাণ উৎসাহ, যে পরিমাণ যত্ন, যে পরিমাণ একাগ্রতা বাণিজ্যে দিয়াছে, জর্ম্মণি অন্য বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক একাগ্রতা বিন্যস্ত করিয়াছে। তাই বলি, জাতীয় উন্নতি-অবনতি জাতীয় একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। যে জাতির যে দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, সে জাতি সেই পথেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। আমাদের জাতীয় একাগ্রতা নাই—একাগ্রতা দূরের কথা—আমাদের জাতীয়-জীবন নাই, তাই আমরা ছোট—আমরা বড় থাকিয়াও ছোট হইয়াছি। আমাদের উন্নতির পক্ষে, এক্ষণে জাতীয়-জীবন সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। জাতীয়-জীবন হউক, পরে উন্নতি হইবে। মাথা নাই তার মাথাব্যথা! জীবনই নাই, তার উন্নতি! তাই বলি সংবাদপত্রলেখক, ভাই কৃতবিদ্য সম্প্রদায়, উন্নতির কথা এক্ষণে থাক্, যাহাতে জাতীয়-জীবন সংস্থাপিত করিতে পার, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তুমি অবশ্য এ কথা বলিতে পার যে,

যদি জাতীয়-জীবনাভাবে উন্নতি একেবারে অসম্ভব, তবে ইংরেজাধিকারমধ্যে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহা হইল কেমন করিয়া ? একেবারে যে হইতেই পারে না, তাহা কে বলিতেছে ? আমার বক্তব্য, যাহার নাম প্রকৃত উন্নতি, তাহা হয় না। ইংরেজাধিকারের প্রারম্ভাবধি এ কাল পর্য্যন্ত আমরা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছি, স্বীকার করি, কিন্তু আর অধিক বাড়িব না। যেটুকু হইয়াছে, সে সকল আমাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, আমাদের প্রতিভার তীক্ষ্ণতার দরুণ। অন্য কোন বিজিত দেশে, এই কালের মধ্যে এ পরিমাণ উন্নত হইত না। এই কালের মধ্যে কবে কোন্ বিজিত জাতি বিদেশীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যে এত-দূর দখল পাইয়াছেন ? আমরা সেক্ষপীয়রের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি—কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ "কুমারসম্ভবে"র কবিত্ব অথবা উত্তররামচরিতের গভীরতার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে ? আমরা কেমন বুঝিতে পারি, হিজেলের কূটমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ক্যাণ্টের জটিলতা পরিষ্কার করিতে পারি—অন্য কোন্ বিজিত জাতি পারিত ? বিজিত জাতি থাক্, কয়জন ইংরেজ পণ্ডিত সাংখ্যদর্শনের জটিলতা পরিষ্কার করিতে পারে ? শঙ্করাচার্য্যের অমানুষী প্রতিভা, অমানুষী বিদ্যার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে ? কেবল বুদ্ধিতে উন্নতি থাকিলে আমরা সর্ব্বপ্রধান না হই অবশ্য এক প্রধান জাতি হইয়া থাকিতাম। তাই বলি, অগ্রে জাতীয়ত্ব সংস্থাপনে

যত্ন কর। কি, কেমন ভোলা মন, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি।

একটা প্রাণের ব্যবসায় করিলে হয় না? একটা ঘর ভাড়া লইয়া বড়বাজারে একটা প্রাণের দোকান খুলিলে হয় না?

কিন্তু ব্যবসায় চলিবে না। এ জিনিস বসিয়া বিক্রয় হয় না। ইহার গ্রাহক আপনা হইতে জুটে না। অনেক ভিখারী জুটিতে পারে, কিন্তু গ্রাহক জুটে না। জিনিস ভাল বটে—*পাইলাম না বলিয়া কত জন কাঁদিয়া মরে, পাইলে সকলেই চরিতার্থ হয়, পাইয়া হারাইলে সকলে মরমে মরিয়া* থাকে। জীবন অন্ধকার হয়, সংসার শূন্য হয়, জগতের বৈচিত্র্য মুছিয়া যায়, জ্যোতিষ্কনিচয় হীনপ্রভ হইয়া যায়, সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য ধুইয়া যায়, বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠে, মন-পতঙ্গ তাহাতেই পড়িয়া ছট্‌ফট্ করে, প্রাণ উদাস হইয়া যায়, মরিতে ইচ্ছা করে। জিনিস ভাল বটে, কিন্তু আপনা হইতে কেহ লইতে আসে না। পায়ে ধরিয়া, হাতে ধরিয়া, চক্ষের জল দিয়া অভিষেক করিয়া দিতে হয়, নতুবা কেহ লয় না। যে প্রাণের ব্যবসা করে, সে যে বঞ্চক নয়, তায় বিশ্বাস কি? যাহা খুঁজিয়া মেলে না, তাহার ব্যবসায়ীর সত্যবাদিতায় কে বিশ্বাস করিবে? তাই বলিয়াছি ত দোকান করিলে চলিবে না। জিনিস ভাল বটে, কিন্তু এ পাপ সংসারে কোন্ ভাল জিনিসটার আদর আছে? জগৎপদ্ধতির কাছে, কোন্ ভাল জিনিসটার

আদর আছে? কুসুম শুকাইয়া যায়, সৌন্দর্য্য বিকৃত হয়, প্রেম ভাঙ্গিয়া যায়, রমণী কাঁদে—কোন্ ভাল জিনিসটার আদর আছে? স্ত্রীলোকের পক্ষে, পুরুষের পক্ষে একই নিয়ম—যে আগুনে আমাদের হাত পোড়ে, সেই আগুনে তাহাদের পোড়ে। আমাদের পুড়ুক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাহাদের পুড়িবে কেন? যে রোগে আমরা ক্লিষ্ট হই, সেই রোগ তাহাদের উপরও অত্যাচার করে। আমরা মরি, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু তাহাদের মাথা ধরিবে কেন? তাহাতেই বলি, কোন্ ভাল জিনিসটার আদর আছে? সূর্য্যরশ্মিতে রোগ-জননতা আছে, বন্ধুত্বে কলহ আছে, প্রণয়ে বিরহ আছে, স্নেহে সীমাবদ্ধতা আছে, বায়ুহিল্লোলে সংক্রামকতা আছে, রমণীর কণ্ঠে পরুষ-কথা আছে, রমণীর চক্ষে জল আছে, রমণীর হৃদয়ে দুঃখ আছে—আবার বলি, কোন্ ভাল জিনিসের আদর আছে? চন্দনের ফুল নাই, কিংশুকের গন্ধ নাই, ইক্ষুর ফল নাই, সঙ্গীতের দর্শনোপযোগিতা নাই, সুখে শান্তি নাই, শান্তিতে সুখ নাই—কোন্ ভাল জিনিসটা একেবারে ভাল? যে নলিনীবন দর্শনকারীর আনন্দ, সেই নলিনীবনই সন্তরণকারীর মৃত্যু; যে সভ্যতা ইংরেজের গৌরব, সেই সভ্যতাই আমাদের সর্ব্বনাশ; যে চিন্তাশক্তি তোমার সুখ, সেই চিন্তাশক্তিই আমার কাল; যে চাঁদ তোমাকে আনন্দিত করে, সেই চাঁদই আমাকে কাঁদায়, যে ভালবাসা তোমাকে স্বর্গসুখ দেয়, সেই ভালবাসাই আমাকে

নরকযন্ত্রণা দেয়—কোন্ ভাল জিনিসটা একেবারে ভাল? কিন্তু ঐ যে ডাকিতেছে—"চাই বেল ফুল!" আচ্ছা, উহার ন্যায় প্রাণের বোঝা মাথায় লইয়া, পথে পথে, গলিতে গলিতে, বাড়ীতে বাড়ীতে ডাকিয়া বেড়াইলে হয় না? ডাকিলে হয় না—"তোমরা কেহ প্রাণ নেবে গো? যে লয়, সে কাঁদে; যে না লয়, সে কাঁদে; যে দেয়, সে পাগল হয়; যে না দেয়, সে লোক ভাল নহে; তোমরা কেহ এ অধমের প্রাণ নেবে গো?" না। ও কথা শুনিলে আর কে লইতে আসিবে? তবে না হয় বলিব—"জিনিস বড় ভাল; ইহা কাছে থাকিলে কার্য্যে উৎসাহ হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, সংসারে অনুরাগ হয়, আশায় বিশ্বাস হয়, কেবল রাত্রে নিদ্রা হয় না—কেউ প্রাণ নেবে গো?" এবারও হইল না। ঐ যে একটা কু থাকিল। ওটা যে কু নয়, ও জাগরণ যে সুখের জাগরণ, তাহা আমি যেন বুঝিলাম, কিন্তু সকলে কি বুঝিবে? তবে ও কথাটা ছাড়িয়া দিয়া বলিব—"জিনিস অতুল; যে বিক্রয় করে, তার পরলোকে মুক্তি হয়; যে ক্রয় করে, সে যৌবন ফিরিয়ে পায়, সংসার সুন্দর দেখে; তার অধরের হাসি ফিরিয়া আসে, চক্ষের জল শুকাইয়া যায়; সে সশরীরে স্বর্গসুখ ভোগ করে—তোমরা কেহ প্রাণ নেবে গো?" বেশ কথা। কিন্তু ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া যায়, তবু কেহ লইতে চাহে না। পরের প্রাণ লইতে গেলেই আপনার প্রাণটা যায়—অনেকের ভাগ্যেই,

নিজের প্রাণটা আগে না খোয়াইলে, পরের প্রাণ পাওয়া যায় না। নিজের যায় বলিয়া পরের প্রাণ কেহ লইতে চাহে না। আবার ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিলে অনেক গ্রাহক মিলে কিন্তু সমস্ত প্রাণ কেহ লইতে চাহে না। প্রাণের সুখটুকু অনেকে চায়, প্রাণের দুঃখটুকু কেহ লইতে চাহে না ; মনের আনন্দটুকু লইতে চাহে, হৃদয়ের অবসাদটুকু লইতে চাহে না—সুখের সুখী ঢের মিলে, দুঃখের দুঃখী মিলে না। ঐ ত দুঃখ! দুঃখের দুঃখী মিলে না—মনের কথা বলিবার জন্য মনের মত মানুষ খুঁজিয়া পাই না।

দুঃখ কেবল একজন লইতে পারে, কেবল একজন লইতে চায়। কিন্তু সে থাকিলে আবার দুঃখই কি? ধন না থাক্, ঐশ্বর্য্য না থাক্, বন্ধু না থাক্—সহায় না থাক্, গৃহ না থাক্, দাঁড়াইবার স্থান না থাক্—কিন্তু সে থাকিলে আবার দুঃখ কি? রোগ-শোক থাক্, জ্বালা-যন্ত্রণা থাক্—সহস্র দুঃখ থাক্—সে যদি থাকে, তবে দুঃখ কি? ক্ষুধায় যদি জঠর জ্বলে, তৃষ্ণায় যদি ছাতি ফাটে, সংসার জ্বালায় যদি বুক চড়্-চড়্ করে—তবু তার মুখ দেখিলে আবার দুঃখ কি? সে নাই বলিয়াই ত দুঃখ; নতুবা আর প্রাণের ব্যবসায় করিতে আসিব কেন? এখন যাচিয়া দিতে যাই, কেহ লয় না; লও লও করিয়া লোকের পায়ে ধরিয়া সাধিয়া বেড়াই, কেহ লইতে চায় না! সে পাছে হারাই, এই ভয়ে মরমে মরিয়া থাকিত। দখলীস্বত্বের নূতন মঞ্জুরিচিহ্ন পাইলেই সে আপনাতে আপনি থাকিত না।

আমিও সেই গদ্‌গদভাব দেখিয়া, আমাতে যেন আর আমি থাকিতাম না, কেমন যেন হইয়া যাইতাম। মনে করিতাম, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া দশ হাতে চাপিয়া রাখি—শরীরের পার্থক্যটুকুও গায়ে সহিত না। কি যেন হইতাম, কেমন যেন হইতাম—গলিয়া জল হইতাম না, কিন্তু গলিয়া কেমন যেন হইতাম। সে ভাব ভুলিয়া গেলাম, —বহুদিবস অভ্যাস না থাকায়, ভুলিয়া গেলাম—বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই, বহুদিন পরিচয় নাই, মন হইতে প্রায় যাব যাব হইয়াছে। সব আছে—হাসি আছে, রোদন আছে, স্নেহ আছে, প্রেম আছে, অনুরাগ আছে, আশা আছে—না থাকিলে কি মানুষ বাঁচে? অল্প হোক্, অধিক হোক্, সবই আছে—কেবল সেই গলিয়া-কেমন-হওয়া ভাবটি নাই। বড় মধুর ভাব! স্মৃতিতে দেখা দিলে, এখনও যেন কেমন হইয়া যাই, কিন্তু তেমন আর হই না। তাহাকে বাহিরে চক্ষে দেখিয়া আবার বুকের ভিতর চক্ষু ফুটাইয়া বুকের ভিতর তাহাকে দেখিয়া—যুগপৎ অন্তরে বাহিরে তাহাকে দেখিয়া যেমন হইতাম, তেমন আর হই না। এখন ঠিকানা থাকে; তখন, কি যে করি তার ঠিকানা পাইতাম না। সেই ভাব-টুকুর জন্য, সেই গলিয়া-কি-হওয়ার জন্য, এখনও প্রাণ হাতে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া বেড়াই; কিন্তু এখন যাচিয়া দিতে চাই, তবু কেহ লইতে চাহে না। তেমন আর

মিলে না। এ সংসার-রত্নাকরে ঢেরই রত্ন আছে, কিন্তু তেমন আর নাই। এ অনন্ত বিশ্বে ঢের চাঁদ আছে, কিন্তু এ ছার পৃথিবীতে একটা বৈ না, জুপিটরে চারিটা, ইউরেনসে ছয়টা, সেটরনে আটটা—আমাদের এ পাপ লোকে একটা বৈ না। আমাদের হৃদয়েও একটা বৈ না! একবারমাত্র আপনা অপেক্ষা পর বড় হয়। কেবল একজনের সহিত তুলনায়, অখিল সংসার তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। অন্যকে যত্ন করিতে পারি, শ্রদ্ধা করিতে পারি, আদর করিতে পারি, সোহাগ করিতে পারি—কিন্তু ভালবাসা কেবল সেই। আমাদের প্রথম ভালবাসাই, আমাদের শেষ ভালবাসা। আমাদের প্রথম ভালবাসাই, আমাদের একমাত্র ভালবাসা। যে মূর্ত্তি দিনান্তে সহস্রবার দেখিয়াও চক্ষের তৃপ্তি হয় নাই, যে মূর্ত্তি চিরকাল চক্ষে লাগিয়া থাকে, যে মূর্ত্তি একবার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি চিরকাল হৃদয়ে থাকে। সময়-স্রোতে সব ধুইয়া যায়—রূপ, যৌবন, প্রফুল্লতা, সুখ, আশা সব ভাসিয়া যায়; কিন্তু হৃদয়ের দাগ মুছে না—হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিতে না পারিলে, সে দাগ যায় না। তেমন কেহ হয় না। যে যায়, তার মতন কেহ হয় না। তারপর আবার নূতন বন্দোবস্ত কেবল ভূতের বোঝা বহন করা মাত্র। কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম।

প্রাণের ব্যবসায় করিব। কিন্তু কি মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিলে লাভ হয়? কি মূল্য পাইলে দিতে পারি? রূপ?

রূপে কি হয়? যে চঞ্চল, সে আরও চঞ্চল হয়; যে পাগল, তার পাগ্‌লামি বাড়ে; যে নির্ব্বোধ, তার বুদ্ধি লোপ পায়; যার আগুন আছে, তার আগুন জ্বলিয়া উঠে; যার পা চলিতেছে, সে গড়ায়। আমি রূপ লইয়া কি করিব? রূপ কয় দিনের জন্য? নবদূর্ব্বাদল-বিলম্বি-নীহারবিন্দুর ন্যায়, বৃষ্টিসম্পাতোদ্ভূত জলবিম্বের ন্যায়, ইন্দ্রিয়ের বশ্যতার ন্যায়, প্রণয়ীর সুখের ন্যায়, পতনশীল নক্ষত্রের ন্যায়, মনুষ্যের জীবনের ন্যায়, আমার মানসপটে সেই মুখখানির ন্যায় এই আছে এই নাই। রূপে প্রয়োজন নাই—রূপ লইয়া কি করিব?

তবে শান্তি! তবে আর এ ব্যবসায়ে কাজ কি? জাহ্নবীর গর্ভে শয়ন করিলেই ত হইতে পারে—লোকের হাতে পায়ে ধরা কেন? জাহ্নবী-সৈকত-শয্যায় চিরদিনের মত শয়ন করায় যে শান্তি, তেমন শান্তি আর কোথায়? তবে সুখ! মন্দ কি? তবে তাই।

কল্পনা-সহায়ে বাটীর বাহির হইলাম, ডাকিলাম—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম—"কেহ প্রাণ নেবে গো?" এক বার—দুই বার—তিন বার—কেহ লইতে চাহিল না। একটি গৃহের অভ্যন্তর হইতে নৈশ-গগন বিদীর্ণ করিয়া, আনন্দ-ধ্বনি উঠিতেছিল। বিপন্ন লোক তৃণ পাইলে তৃণই অবলম্বন করে। মনে করিলাম এইখানেই যদি প্রাণের গতি হয়। গৃহে প্রবেশ করিলাম। ডাকিলাম—"প্রাণ নেবে গো?" একটি স্ত্রীলোক

বাহির হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—“মূল্য কত ?” আমি বলিলাম—“সুখ।”

রমণী একটু হাসিয়া বলিলেন—“সুখ ? সুখ কে কাহাকে দিতে পারে ? সুখ আপন আপন আয়ত্ত। আমাদের সহবাসকে লোকে স্বর্গবাস বলে। কথা ঠিক ; কিন্তু এ উপমার প্রকৃত সৌন্দর্য্য সকলে বুঝে না। স্বর্গে সুখভোগ হয়, কিন্তু আপন সুখ সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়। আমরাও যাকে তাকে সুখী করিতে পারি না—ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভানে।”

একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিলেন। প্রাণের ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া সকলেই কৌতূহল-পরবশ হইলেন। একজন জিজ্ঞাসিলেন—“তোমার নিকট কতগুলি প্রাণ আছে ?”

আমি বলিলাম—“একটি বৈ না।” সুন্দরী বলিলেন—“একটি জিনিস লইয়া কি ব্যবসায় হয় ?” আর একজন উঠিয়া বলিলেন—“কৈ দেখি কেমন প্রাণ ?” ব্যস্ত হইয়া প্রাণ খুলিয়া দিলাম। সুন্দরী দেখিয়া বলিলেন—“এ প্রাণ কে লইবে ? এ যে ড্যামেজ প্রাণ। ইহাতে উৎসাহ কৈ, রস কৈ, প্রফুল্লতা কৈ আশা কৈ—এ ড্যামেজ জিনিস কে লইবে ? এ যে ব্যবহার করা জিনিস ! আর কাহারও কাছে বিক্রয় করিয়াছিলে না কি ?” আমার বুকের ভিতর সাগরমন্থন আরম্ভ হইল। মস্তক ঘুরিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, শুষ্ক

কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল—"বিক্রয় করি নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বিক্রয় করি নাই। একজন কাড়িয়া লইয়াছিল। আমার অজ্ঞাতসারে ঘরে সিঁদ দিয়া চুরি করিয়াছিল। একদিন তখন শরতের চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল—একদিন শেষ-রাত্রে অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল; একটি নিদ্রিতা বালিকার মুখ বড় সুন্দর লাগিল। শেষ-নিশায় মৃদু-পবনে জ্যোৎস্নাস্রোত আসিয়া সেই মুখের উপর পড়িয়াছিল—বড় সুন্দর লাগিল। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, ঘুমের ঘোর ছিল—মুখখানি বড় সুন্দর লাগিল। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই মুখ দেখিতে লাগিলাম—বুকের ভিতর নূতন সুখের তরঙ্গ উঠিল। চিন্তাস্রোত নূতন-পথ ক্ষোদিত করিয়া ছুটিল! ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, সেই মুখ দেখিলাম—বড় সুন্দর লাগিল। আকাশের চাঁদকে দেখিলাম—বড় সুন্দর লাগিল! চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সংসার বড় সুন্দর লাগিল। বুকের ভিতর চাহিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! আমার প্রাণ চুরি গিয়াছে। অনুসন্ধান করিলাম। চন্দ্রদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—চন্দ্রদেব হাসিয়া উঠিলেন। বৃক্ষলতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা মাথা নাড়িল। কুসুমসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা হাসিয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। সমীরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সমীরণ 'হায়, হায়' করিল। পরদিন সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বালিকা মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া ঘর

হইতে পলাইয়া গেল। বুঝিলাম—সেই চোর, নতুবা পলাইবে কেন?” সুন্দরী বলিলেন—“চোরকেই যদি চিনিলে, তবে জিনিস ফিরাইয়া চাহিলে না কেন?”

ফিরাইয়া চাহিব? ও হরি! কাহার কাছে ফিরাইয়া চাহিব? কে ফিরাইয়া চাহিবে? সেই মুখে সেই মধুর হাসি দেখিয়া মনে করিলাম—নিদারুণ বিধি! একটা বৈ প্রাণ দাও নাই কেন? তাহা হইলে, একটা ত গিয়াছেই, বাকি কয়টা দিয়া দক্ষিণান্ত করিতাম। তখন সংসার চিনিতাম না। ভাল-বাসিলেই যে কাঁদিতে হয়, তাহা কে জানিত? এমন যে হইবে, তাহা কে জানিত? বলিলাম—“ফিরাইয়া চাহিব কি, সেই মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম।” রমণী বলিলেন—“তবে আবার ব্যবসায় করিতে আসিয়াছ যে বড়?” আমি উত্তর করিলাম—“দুঃখের কথা বলিব কি, সে এখন নাই। ‘কাল-সমুদ্রে উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া উভয়ে সন্তরণ করিতেছিলাম, সে ডুবিল, কই আর উঠিল না। পূর্ব্বে লোকের মুখে শুনিয়াছি, এ সমুদ্রের কাণ্ডারী আছে। তখন অন্য বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর ছিল না; লোকে যাহা বলিল, তাহাই বিশ্বাস করিলাম। সেই দিন কাতরভাবে, ব্যাকুলভাবে ডাকিলাম—‘অনাথনাথ! ভবপারাবার-কাণ্ডারি! আমার প্রাণাধিক—আমার জীবনসর্ব্বস্ব এই জলে ডুবিয়াছে, তুলিয়া দাও। দরিদ্রের রত্ন খুঁজিয়া দাও।’ কত ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম—লোকের মিথ্যা কথা। এ

পারাবারের কাণ্ডারী নাই।” সুন্দরী বলিলেন—“সে ত গিয়াছে, কিন্তু তোমার প্রাণ কি তোমায় ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে ?” আমি বলিলাম—“ফিরাইয়া দিয়া যায় নাই, সঙ্গে করিয়াও লইয়া যায় নাই—ফেলিয়া গিয়াছে !” সুন্দরী হাসিলেন ; বলিলেন—“তবে ত তুমি লোক ভাল নহ ! সে যখন তোমায় দিয়া যায় নাই তখন সে জিনিসে তোমার অধিকার কি ? তুমি তাহা বিক্রয় করিবে কি বলিয়া ? কার ধন কে বিক্রয় করিবে ? চিত্তচোরকে চিনিয়াও যখন তুমি হৃত জিনিস ফিরাইয়া লইবার কথা মুখে আন নাই, তখন তাহা দান করাই হইয়াছে। দিয়া যে ফিরাইয়া লয়, সে মহাপাপী ?” আমার স্মৃতিসাগর মথিত হইল। হৃদয়ের অর্দ্ধেক শোণিত শোষণ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইল। চক্ষে জল আসিল। কাঁদিলাম। আর কিছু বলিবার মুখ ছিল না,সেখান হইতে বাহির হইলাম। পথে আসিতে আসিতে ভাবিলাম—তাই ত, ে হার মোটা বুদ্ধিতে ঐ সামান্য কথাটা যোগায় নাই ! সে লে ভাল নহেই ত বটে ! একবার যে জিনিস একজনকে দিয়াছি, তাহা আবার একজনকে দিবার অধিকার কি ? যাহা দিয়াছি, তাহা গিয়াছে। কিন্তু ঐ ত জ্বালা ! জিনিস দিলে আর পাওয়া যায় না। গেল—সাফ গেল—একেবারে, হাতের বাহির ! কিন্তু তা না হইলে আর দেওয়াই কি ? তাই ত বটে, আর এক জনকে যে দিতে যায়, সে লোক ভাল নহে

কিন্তু মানুষ যায়—যাহা দিই, তাহা ফিরাইয়া দিয়া যায় না কেন? তার অভাব হয়, কিন্তু সেই অভাবের অভাব হয় কেন? জিনিস যায়, তাহার স্মৃতি থাকে কেন? স্মৃতি! স্মৃতি! ঐ ত কু। উহার অস্থি মজ্জার সঙ্গে অভাব মিশিয়া রহিয়াছে। ঐ কথাটার অর্থই—কি যেন নাই। যাহা নাই তাহারই মানসিক ভাবসমষ্টির নামই ত স্মৃতি। হারান জিনিসের তালিকা বই আবার স্মৃতি কি? এক একটি করিয়া জিনিস যায়; আর তাহার নাম, তাহার গুণাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ, তাহার সুখ-প্রদায়িত্বের উগ্রচিত্র, এ তালিকায় উঠে। কেন এমন হয়? যাহা যায়, তাহার নাম পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় না, কেন? যে জিনিস নাই, তাহার নাম কেন? পাপ স্মৃতি কেন? কিন্তু স্মৃতি না থাকিলে কি মনুষ্যের উন্নতি হইত? নাই বা হইল। যাহাকে লোকে উন্নতি বলে, তাহাতে কি কাহারও সুখবৃদ্ধি হয়? সমাজের উন্নতিনিবন্ধন কে কোন্ কালে সুখী হইয়াছে? দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের লোক আমাদের অপেক্ষা দুঃখী ছিল কি? তাহাদের মেহগ্‌নি টেবিল ছিল না; ইজি-চেয়ার ছিল না: তাহারা ফ্রি উইল, নেসেসিটি জানিত না; তাহারা অগ্নিযান, জলযান কখনও শুনে নাই; তাহারা হন্টিং বুট পায়ে দিত না; তাহাদের উপাধানের তলে ম্যাচ্ থাকিত না, টেবিলের উপর ঘড়ি টক্-টক্ করিত না—কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আমাদের অপেক্ষা দুঃখী ছিল কি? মনুষ্যের

সুখ-দুঃখ কি পেণ্টুলন, কোট-হ্যাটের উপর নির্ভর করে? সামাজিক উন্নতিতে কখনও কাহারও চক্ষের জল শুকাইয়াছে কি? কখনও কাহারও শূন্যহৃদয় ভরিয়াছে কি? কখনও কাহারও হৃদয়-মরুভূমে কুসুম ফুটিয়াছে কি? কখনও কাহারও হারান ধন ফিরিয়া আসিয়াছে কি? কিছু না। মনুষ্যের সুখ-দুঃখ অভাব লইয়া। যার অভাব আছে, এবং যার সেই অভাব যত্ন করিলেই পূর্ণ হয়, সেই সুখী। যার সকল অভাব পূর্ণ হয় না, সে দুঃখী। যার অধিকাংশ অভাব পূর্ণ হয় না, সে ততোধিক দুঃখী। যার প্রধান অভাব অপূরণীয়, সে ততোধিক দুঃখী। যাহা অপ্রাপ্য, তাহার জন্য সে লালায়িত, সে বড় দুঃখী। আবার যার কোনও অভাব নাই, তার ন্যায় দুঃখী জগতে নাই। অভাব না থাকাও সুখ নহে। অভাব থাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে তবেই সুখ। আবার যাহাদের অধিক অভাব, তাহাদের দুঃখ-সম্ভাবনাও অধিক। যাহার অভাব অল্প, তাহার দুঃখ-সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অল্প। উন্নতিতে অভাব-বৃদ্ধি হয়, সুতরাং দুঃখ-বৃদ্ধি হয়। তাড়িত-বার্ত্তাবহ না থাকা, উন্নত জাতির পক্ষে অসুখের কারণ হইতে পারে; কিন্তু যাহারা, ইহা না থাকাকে অভাবমধ্যে গণ্য করে না, তাহাদের তাড়িত-বার্ত্তাবহ না থাকায় দুঃখ কি? উন্নতিতে বিলাসের উপকরণ বাড়ে মাত্র। কিন্তু কি বলিতে-ছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—স্মৃতি কেন? স্মৃতি না থাকিলে মনুষ্যের উন্নতি হইত না? না হইল, নাই—বুকের ভিতর এ

সমুদ্রোচ্ছ্বাস ত থাকিত না। নৈরাশ্য-বায়ু যে অন্তরের ভিতর হু হু করিতেছে, তাহা ত থামিত। হৃদয়ের এ স্পষ্ট হাহাকার ত উপশমিত হইত; কিন্তু মনুষ্যের অনেকটা সুখও স্মৃতিমূলক! স্মৃতির অভাবে, সে-সুখের অভাব হইত যে! হোক্—সুখ গেল, তাহার সঙ্গে যদি দুঃখ যায়, তাহা হইলে সুখ যাক্ তাহাতে আপত্তি নাই। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। দিবানিশি বুকে করিয়া অনল বহিতে আর পারি না। নিরন্তর হৃদয়ের পরতে পরতে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক-দংশন হইতেছে, তাহার উৎকট যাতনা আর সহে না।

আর এই পাপস্মৃতি আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমাকে পোড়ায়। শীতকালে সন্ন্যাসী যেমন, যে বৃক্ষতলে আশ্রয় লয় তাহারই ডাল ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালে, স্মৃতিপিশাচী তেমনই আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া, আমাদেরই অনিষ্ট করে—আমাদেরই প্রাণের ভুল ভাঙ্গিয়া কালানলে পোড়ায়। নরাধম মেকলে যেমন আমাদের টাকা খাইয়া আমাদেরই আশ্রয়ে, আমাদেরই অন্নে উদর পোষণ করিয়া ইতর লোকের ন্যায় আমাদিগকেই অভদ্রোচিত গালিগালাজ করিয়াছে; স্মৃতিপিশাচী তেমনি আমাদেরই বুকে আসিয়া, আমাদেরই হৃদয় চর্ব্বণ করে। মেকলে সাহেবকে, যাঁহার ভাল বলিতে রুচি হয়, তিনি বলুন, আমি বলিব না। মিছামিছি ভদ্রলোকের নামে যে কলঙ্কারোপ করিতে পারে, সে যদি ভদ্রলোক, ত ছোটলোক কে? কিন্তু স্মৃতির কথা কি

বলিতেছিলাম—পিশাচী আমাদের হৃদয় চর্ব্বণ করে। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া যে বিকট শোণিতধারা বহে, তাহাকেই সাধারণ লোকে অশ্রুধারা বলে—ভাষা-কথায়, সেই স্মৃতিপিশাচী-চ[illegible]-নিঃসৃত শোণিতপ্রবাহের নাম—চক্ষের জল! বম্ কেদার! অশ্রু শব্দের ইহার অপেক্ষা সদর্থ আজি পর্য্যন্ত হয় নাই। বলিহারি, ভরসা করি, ভবিষ্যৎ-অভিধান-প্রণেতৃগণ আমার এই অর্থ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাঃ, সব গোলমাল হইয়া গেল—কিন্তু এ জন্মে আর প্রাণের গতি করিতে পারিলাম না। আর প্রাণের ব্যবসায় করা হইল না! যাহাতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারিলাম না, তাহা লইয়া ব্যবসায় করিব কি বলিয়া? বুঝিলাম, আমার দুঃখ-নদীর কূল নাই। ভগ্ন-চিত্ত আরও ভাঙ্গিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ণিমার শশী

তর তর করিয়া আপন মনে কোথায় যাইতেছ, একবার দাঁড়াও দেখি হে! দাঁড়াও; একবার ভাল করিয়া তোমায় দেখি। এ দুঃখের মনুষ্য-জীবনে দুঃখ অনন্তবিধ; কিন্তু মর্ম্মান্তিক দুঃখ এই যে, কিছুই ভাল করিয়া দেখা হয় না। যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা দেখিয়া মোহিত হইলাম, যাহা দেখিয়া আবার দেখিবার জন্য লালায়িত হইলাম—কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল না। কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; ইন্দ্রধনু দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া গেল: ক্ষণপ্রভা যেমন ভাসিল, অমনি ডুবিল—কিছুই নয়ন ভরিয়া দেখা হইল না। আর কুসুমের সৌকুমার্য্য, বিদ্যুতের শোভা, ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য, সায়াহ্ন-গগনের কোমলতা, বসন্ত-পবনের মাধুরী, চন্দ্ররশ্মির পবিত্রতা—যেখানে একাধারে মিলিত দেখিলাম, তাহাও কোথায় চলিয়া গেল! কোথায় চলিয়া গেল—

"ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

একবার দাঁড়াও দেখি হে! একবার দাঁড়াও, একবার নয়ন ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া তোমায় দেখি। তোমায় বড়

ভালবাসি। তুমি সুন্দর, তাই তোমায় ভালবাসি। তুমি কোমল, তাই তোমায় ভালবাসি। যেমন তোমার হৃদয়ে, তেমনি আমারও হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে, তাই তোমায় ভালবাসি। আর ভালবাসি তোমার ঐ—

"ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগললোচন, মুখে মৃদু মৃদু হাস।"

শুদ্ধ কি ঐ জন্য? তা ত নয়। আর কিছু আছে কি? এ ভালবাসার ভিতর—এ কেবল চক্ষের ভালবাসার ভিতর আর কিছু আছে কি? তুমি আকাশের চাঁদ, আমাদের আকাশকুসুম—কখনও ত বুকে করিতে পাইব না—বুকে রাখিয়া, একশ বার পলকে একশ বার, মুখখানি চাহিয়া দেখিতে ত পাইব না। বলিবার কিছু নাই, তবু বলি বলি মনে করিয়া, কেবল স্পর্শ-সুখটুকুর জন্য, কখনও ত অনর্থক জাগিয়া রাত পোহাইতে পাইব না। কখনও ত আমার জন্য একটু অধিক হাসি আমি আসিয়াছি বলিয়া একটু অধিক আহ্লাদ ও চাঁদমুখে দেখিতে পাইব না। কখনও ত বচনামৃত কর্ণ-বিবর ভরিয়া ঢালিবে না—কেবল চক্ষের ভালবাসা ইহার ভিতর আবার কিছু আছে কি? বুঝি তাই। তোমাকে দেখিলে স্মৃতির গভীর অন্ধকারের ভিতর কি যেন অস্পষ্ট দেখিতে পাই; আবার পলকের মধ্যে কই আর দেখিতে পাই না। খুঁজি, পাই না। যেদিকে তাকাই—শূন্য। তাহা—যাহা চাই, তাহা কই পাই না। সংসার খুঁজিয়া দেখি, সে স্পর্শমণি একখানা বৈ ছিল না।

অন্তরে চাহিয়া দেখি, ধূ ধূ করিতেছে—দিগন্ত ব্যাপিয়া, হৃদয়াকাশ ভরিয়া কি যেন ধূ ধূ করিতেছে। সেই কি যেন, কিছুই যেন নয়। মরুভূমি নয়, অরণ্য নয়, সাগর নয়, অকূল নদী নয়, আকাশ নয়; যাহা কিছুর সহিত লোকে দগ্ধ-হৃদয়ের তুলনা দেয়, তাহা নয়—সেই কি যেন কিছুই যেন নয়। মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, অরণ্যে জীব আছে, প্রান্তরে সরসী আছে, সাগরে দ্বীপ আছে, নদীতে জল আছে, আকাশে তারা আছে—হৃদয়ে কিছু নাই। এ নদীর কূল নাই, এ নদীতে খেয়া নাই; ইহাতে মৎস্য ভাসে না, চন্দ্র হাসে না, নক্ষত্র নাচে না, প্রতিবিম্ব পড়ে না; এ নদীতে জল নাই, মৃত্তিকা নাই, বালুকা নাই—এ নদী শূন্যময়। এ আকাশে ভানু নাই, শশী নাই, নক্ষত্র নাই; মেঘ উঠে না, বিদ্যুৎ হাসে না, উল্কাপাত হয় না, বজ্র গর্জ্জে না—এ আকাশ আকাশময়; এ মরুভূমে সূর্য্যরশ্মি পড়ে না, বায়ু বহে না, উত্তাপ লাগে না; ইহাতে বালুকা নাই, মৃত্তিকা নাই, খণ্ডকুঞ্জ নাই—এ মরুভূম মরুভূময়। এ অরণ্যে সরসী নাই, বৃক্ষ নাই, লতা নাই, তৃণ নাই, পথ নাই; ইহাতে বন্যফুল ফুটে না, বনের পাখী গায় না—এ অরণ্য যেন কিছুই নয়। কোথাও খুঁজিয়া পাই না। তার পর অনন্ত দুঃখে, অনন্তে মিশিবার জন্য, অনন্ত আকাশের দিকে যখন চাই, তখন তোমাকে দেখিয়া, আবার সেই স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। তাই কলঙ্কী চাঁদ! তোমার কলঙ্ক-সত্ত্বেও তোমায় এত

ভালবাসি। ক্ষতি বৈ লাভ নাই, দুঃখ বৈ [illegible] নাই, কাঁদাও বৈ হাসাও না, হাস বৈ কাঁদ না—তবু এত ভালবাসি। কেবল সেই অতুল মুখখানির সঙ্গে দূর-সম্বন্ধ আছে বলিয়া—নতুবা তুমি আমার কে? কিন্তু শশি! যাহা মনে পড়ে, তাহাতে বড় যন্ত্রণা পাই! জীবন অন্ধকার, সংসার শূন্য—মন কেমন উদাস হইয়া যায়। আমি সুখ চাহি না; কেন না, সুখ দুঃখ হইতে অবিযোজ্য—সুখ-দুঃখের যে মূর্ত্তি সক্রেটিস্ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। আমি সুখ চাহি না কেবল শান্তির ভিখারী। বলিতে পার চন্দ্রদেব, যেখানে গেলে চক্ষের জল শুকায়, এমন শান্তিনিকেতন কোথায়? তাহাকে ভুলিতে পারিলে বোধ করি, শান্তি পাইতে পারি। তবে, তাহাকে ভুলিব কি? হা অদৃষ্ট! ভুলিব মনে করিলেই ভুলিতে পারি কই? কিন্তু ভুলিতে যদি পারি, তাহা হইলেই [illegible] ভুলিতে চাই? যদি কোনও দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চায়, তবে কি তাহাকে ভুলিতে চাই? তাহা হইলে কি চাই? কি আবার চাই? তাহাকে চাই। ঐ বরটি ছাড়া যদি আর সব দিতে চায়, তবে কি চাই? ভুলিতে চাই কি? না; তাহাকে যদি না পাই, তবে মরিতে চাই। ও বরটিও যদি না পাই—যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় অথচ তাহাকে না পাই, তবে কি ভুলিতে চাই? না; আবার মরিতে চাই! কথা হইতেছে, মৃত্যু যদি না হয়—তবে—তবে—তবে—আবার মরিতে চাই।

মরণ যে হবে না, ও বর যে পাইব না—তবু আবার মরিতে চাই। নতুবা আর কি চাহিব? তাহাকে ভুলিবার কথা মুখে আনিতে পারিব না—আর কি চাহিব? এত যে কাঁদি, সে ত দেখে না; এত যে বিলাপ করি, সে ত শুনে না কই, সান্ত্বনা করিতে ত আসে না—কই, চক্ষের জল মুছাইতে ত আসে না। তবে ভুলিব না কেন। বেশ ত, ভুলিয়া যাইব, আবার এ-অন্ধকারে দীপ জ্বলিবে, এ আকাশে চাঁদ উঠিবে, এ নদীতে নক্ষত্র নাচিবে, এ মরুভূমে কুসুম ফুটিবে, এ সমুদ্রে দ্বীপ ভাসিবে, অরণ্যে পথ জাগিবে, এ মেঘে বিদ্যুৎ হাসিবে; আবার সংসার সুন্দর দেখিব, জগৎকার্য্যে বৈচিত্র্য দেখিব, মনুষ্য-মুখে দেবভাব দেখিব, সকল বিশ্বাস করিব, উচ্চ হাসি হাসিব, পৌষের রজনীকে ক্ষুদ্র বোধ করিব, আবার হৃদয়যন্ত্র বাজিবে, শূন্য হৃদয় ভরিবে, গৃহের আকর্ষণীশক্তি ফিরিবে, চক্ষের জল শুকাইবে, অন্তরের শ্বাস মিলাইবে, দুঃখশর্ব্বরী পোহাইবে—বেশ ত ভুলি না কেন? ভুলিব কি? ভুলিব কি? না, না, হইল না। পারিলাম না, আর কি করিব? মন মানিল না। হৃদয় বুঝিল না, বুক বাঁধিতে পারিলাম না—কি করিব, নাচার। দিবানিশি তাহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া এখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছি। এখন ঐ স্মৃতিই আমার জীবন—ইহা ভুলিলে থাকিব কি লইয়া? শূন্য হৃদয় অপেক্ষা যন্ত্রণা ভাল।

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, এমন

করিয়া মরমে মরিয়াও যে, সেই স্মৃতিমূলে পড়িয়া থাকি—আন্‌চান করি, ছট্‌ফট্‌ করি, কাঁদি, তবু যে সেই জ্বলন্ত-অনল বুকে করিয়া রাখি, তাহার মধ্যে একটু স্বার্থপরতা আছে। হৃদয়ে সে থাকিলে, হৃদয় বেশ পবিত্র থাকে। যে গৃহে সে অতিথি, সে গৃহে কাঠিন্য কার্কশ্য কিছু দাঁড়াইতে পায় না। সে মনে থাকিলে—সে মন ছাড়া কখন? সে মনে থাকিলে, যেন বিনা আয়াসে পরের হাসিতে হাসিতে পারি, পরের কান্নায় কাঁদিতে পারি—যেন আপনা আপনি আপনাকে ভুলিয়া যাই, বেশ যেন অনুভব করি যে, পরকে সুখী করিবার জন্যই এ-মনুষ্যজন্ম। হৃদয় পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু না পুড়িলে অপবিত্রতা দূর হইবে কেমন করিয়া? না পোড়াইলে সুবর্ণও খাঁটি হয় না। শোকদুঃখ না থাকিলে সহৃদয়তা জন্মিবে কেমন করিয়া? স্বীকার করিয়াছি ত একটু স্বার্থপরতা আছে। সে আমার ধর্ম্মের বন্ধন। তাহাকে মন হইতে দূর করিলে, ধর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের মুখ হৃদয়ে না থাকিলে ধর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। অন্য কোনও স্ত্রীলোক এ হৃদয়ে স্থান পায় না—স্ত্রীলোকের কথা পড়িলেই, স্ত্রীলোকের কথা ভাবিলেই অমনি সে আসিয়া সমস্ত হৃদয়টুকু জুড়িয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বলি, তাহাকে ভুলিলে ধর্ম্মের পথে স্থির হইয়া চলিতে পারিব না—আত্মবিসর্জ্জনটা কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। কাগজে কলমে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতে অনেক কথা

লিখিতে পারিলেও পারিতে পারি, কিন্তু এখন যেমন অন্তরের পরতে পরতে তাহা অনুভব করি ; তেমনটি আর থাকিবে না।

সে দিন যখন সেই ভোগস্পৃহাশূন্য সংসারত্যাগী যোগী-পুরুষ বলিলেন—"স্ত্রীলোককে কালভুজঙ্গী জানিয়া তাহার পথের দূরে থাকিও ; যদি ধর্ম্মে মন থাকে, পুণ্যসঞ্চয়ে অভিরুচি থাকে, ইন্দ্রিয়দমনে বাসনা থাকে, স্বর্গে যাইবার অভিলাষ থাকে, তবে কখনও রমণীর মুখ দেখিও না"—তখন আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু মনে মনে হাসিলাম। পাছে তিনি মনে ব্যথা পান, এই জন্য তাঁহার কথায় আপত্তি করিলাম না, কিন্তু মনে মনে হাসিলাম। হা কৃষ্ণ! স্বর্গ-গমনে পাছে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে রমণীর মুখ দেখিব না? হা কৃষ্ণ! রমণীর প্রণয়পবিত্র মুখ দেখিব না ত বুঝিব কেমন করিয়া, স্বর্গ কেমন—দেবতারা কেমন—দেবীরা কেমন—তাঁহারা দেখিতে কেমন—তাঁহাদের পবিত্রতা কেমন—স্বর্গে সুখ কেমন? রমণীর মুখ দেখিবে না, ত শিখিবে কেমন করিয়া, পবিত্রতা কি—ভক্তিপ্রীতি কি—সহিষ্ণুতা কি—আত্মবিসর্জ্জন কি—নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি? ও-মুখ দেখিবে না ত জানিবে কেমন করিয়া নন্দনকাননে যে ফুল ফুটে, সে কেমন ফুল—অপ্সরা-কিন্নরে যে গান গায়, সে কেমন সঙ্গীত—দেবতারা যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, সে কেমন স্নেহ—অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে? এ পাপ সংসারে, রমণীর মুখ ব্যতীত, দেখিবার উপযুক্ত আর কি আছে?

রমণী কণ্ঠ-শব্দ ব্যতীত, শুনিবার উপযুক্ত আর কি আছে? ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য, রমণী-হৃদয়ের ন্যায় আদর্শ আর কি আছে?

ও কি ও শশি! মেঘের আড়াল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া, উচ্চ হাসি হাসিতেছ যে বড়? কি বলিতেছ?—মিথ্যা কথা? মুখের আদর? মুখের বৈ কি; নতুবা অন্তঃপুরবদ্ধা দাসীবৎ করিয়া রাখ কেন? দাসীরও দাসীত্বের সময় আছে, দাসীরও প্রভুপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আছে, দাসীরও বিষয়-বিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, ধর্ম্মে যে বন্ধন, সংসারে যে শান্তিনিকেতন, গৃহে যে, আকর্ষণীশক্তি—তার দাসীত্বের সময় অসময় নাই, তার দাসীত্বে প্রভুপরিবর্ত্তন নাই, তার কোনও স্বাধীনতা নাই; সে জাগিতে ঘুমাইতে দাসী, সে উঠিতে বসিতে দাসী, সে চলিতে ফিরিতে দাসী, সে হাসিতে কাঁদিতে দাসী, সে ভক্তিশ্রদ্ধায় দাসী, সে হৃদয়ে মনে দাসী। তার দাসীত্বের মোচন নাই, তার দাসীত্বের মূল্য নাই, তার দাসীত্বের প্রশংসা নাই। তাকে যত ইচ্ছা পোড়াইতে পার, যে অপমান ইচ্ছা করিতে পার, অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার উপকরণমাত্র করিয়া রাখিতে পার। অপরের ক্রীড়ার পুতুল হওয়ার ন্যায়, যে অত্যাচারী, তাহারই বিলাস-সামগ্রী হওয়ার ন্যায়, অধঃপাত আর কি আছে? তাহারাও মানুষ, তোমরাও মানুষ—তাহাদের উপর এ আধিপত্য তোমাদিগকে কে দিল? শরীরের উপর অত্যাচার

অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার ততোধিক অধর্ম্ম। কিন্তু হৃদয়ের উপর অত্যাচারের ন্যায় অধর্ম্ম জগতে নাই। তোমরা কিসের উপর অত্যাচার না কর? তোমরা আপনাদের জন্য সহস্র বন্ধন রাখিয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব, এক দুর্ব্বল বন্ধনে বাঁধিয়া দাও। যে দীপ প্রতি মুহূর্ত্তে নিবিতে পারে, যে নীহার-বিন্দু প্রতি সূর্য্যরশ্মিতে শুকাইতে পারে, যে লতা প্রতিপদে ছিঁড়িতে পারে, যে কুসুম প্রতি বায়ুহিল্লোলে বৃন্তচ্যুত হইতে পারে, যে ইন্দ্রধনু প্রতি পলকে মিলাইতে পারে, যে শূন্যপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড প্রতিক্ষণে মৃত্তিকাসাৎ হইতে পারে, যে জলবুদ্‌বুদ্‌ কথায় কথায় জল হইয়া যাইতে পারে, তাহার সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বস্ব বাঁধিয়া দাও! তোমাদের এক বন্ধন ছিঁড়ে, সহস্র বন্ধন থাকে। তাহাদের একটিমাত্র বন্ধন; সেইটি ছিঁড়িলেই সব ফুরাইল! সকল অর্থের যে সার, তার এই দুর্দ্দশা—তোমার মুখের আদর নয়? তার পিতা-মাতা নাই, তার ভাই-বন্ধু নাই, ত্রিজগতে তার স্বামী বৈ কেহ নাই! যে দিন বিবাহ হইল, সেই দিন তার মনের সকল নদী স্বামিসাগরে পতিত হইল;—স্বামিই পিতা-মাতা, স্বামীই ভাই-বন্ধু, স্বামীই ধ্যান-জ্ঞান, স্বামীই সর্ব্বস্ব, স্বামীই ইহলোক, পরলোক, স্বামীই চতুর্ব্বর্গ, স্বামিপাদোদক পানই প্রধান কর্ম্ম, স্বামিচরণসেবাই তার পরম ধর্ম্ম, স্বামি-মুখমণ্ডল তার সংসার-সাগরের তরণী, স্বামিচরণারবিন্দ তার ভবসাগরের ভেলা। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, সে বেশ—

সে তোমার প্রতি বিরক্ত হইলেই নরকে যাইবে ; কেন এত অত্যাচার ? কেবল কথার ভালবাসা নয় ? এ সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ সংসার সে দেখিতে পাইবে না কেন ? যাহা করিতে ভাল লাগে, তাহা করিতে পাইবে না কেন ?

কথা কি জান, সকল বিষয়েরই দুই পার্শ্ব আছে। কিছুই একেবারে ভাল নহে—আলোকেও ছায়া আছে ; কিছুই একেবারে মন্দ নহে—শোক হইতে সহৃদয়তা জন্মে। এ কেবল এক পার্শ্ব দেখান হইল। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলও কেবল একপার্শ্ব দেখিয়াছেন। এই জন্য, তাঁহার গ্রন্থে * অসাধারণ শক্তির পরিচয় থাকিলেও সন্দেহ দূর হয় না। ইহার অন্য পার্শ্বও আছে। সমাজপদ্ধতি অনুসারে তাহারা দাসী বটে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সত্য কথা বল দেখি, তাহারা আমাদের দাসী, না আমরা তাহাদের দাস ? ফল কথা, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের দাস, পরস্পর পরস্পরের প্রভু—

"তুমি সে শ্যামের সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ।"

স্ত্রী এবং স্বামীর এই প্রকৃত সম্বন্ধ। আর—সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ সংসার দেখিতে পাইব না কেন ? হা অদৃষ্ট ! সংসার সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ হইলে দেখাইতে কে না চাহিত ? তা নয় বলিয়াই ত দেখিতে দিই না। তাহারা যাহাতে ভাল থাকে,

* Mill's Subjection of Women.

তাহাতে কি আমাদের অসাধ? সংসারের সুখ হইতে ধরিয়া রাখি, এ ইচ্ছা আমাদের নয়। আমাদের বাসনা, সংসারের সুখ হইতে অন্তরে রাখি। স্বাধীন হইয়া কি হইবে? আমরা যে দিবা-রাত্রি বুকে করিয়া রাখি, তাহা অপেক্ষা কি সংসার ভাল? আমরা যে মুখে ঘাম দেখিলে দশদিক্ অন্ধকার দেখি, মুখ মলিন হইলে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, চক্ষে জল দেখিলে তাহা মুছাইবার জন্য প্রাণ দিতে পারি—সংসারে কি ইহার অধিক আদর পাইবে? এ স্বার্থপর সংসারে ও কাঁচা মুখখানির পানে কে তাকাইবে? মনে অভিলাষের উদয় হইতে না হইতে কে সে অভিলাষ পূরাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে? গৃহসরোবরে, স্নেহসলিলে, আদরপবনে সোহাগের বাতাস তুলিয়া মাধুর্য্যের ধ্বজা উড়াইয়া, যে প্রমোদতরণী নাচিয়া বেড়ায়, সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ তরণী সং[illegible] উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল অতল জলরাশির উপর শোক-তাপ-দুঃখ-নৈরাশ্য-প্রবল-ঝ[illegible]-সন্তাড়িত হইয়া বিলোড়িত হইবে, সে কি ভাল? যে বিষম অনলে আমরা অহর্নিশি মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িতেছি, সেই অনলে এই নবনীর পুতুল পুড়িবে, সে কি ভাল? যে চরণে কাঁটা ফুটিলে বুকে শেল বিঁধে, যাহাকে বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া রাখিয়াও, পাছে ব্যথা পায় বলিয়া ভয়ে মরি, উঠিতে-বসিতে সহস্রবার চক্ষু চাহিয়া দেখি, মূর্ত্তিমতী সুকুমারতা হিংসা-দ্বেষে ক্লিষ্ট হইবে, [illegible] ব্যাকুল হইবে—প্রাণ ধরিয়া কি

ইহা দেখা যায়? আমরা মরি, তাহাতে দুঃখ নাই, আমরা সংসারদহনে দগ্ধ হই, তাহাতে দুঃখ নাই—তাহারা সুখে থাক্। তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে, তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন? এত যে জ্বালাতন হই, এত যে দুঃখভোগ করি, কিছুই ত মনে থাকে না—ওই চাঁদমুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাই! পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নমস্কার করি, আমেরিকার দৃষ্টান্তকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি; আমরা, কিন্তু হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে [illegible]। হৃদয়ে রাখিব, হাসিতে দেখিলে হাসিব, কাঁদিতে দেখিলে [illegible]দিব—তাহার প্রতিদানে, কেবল ওই মুখখানি দেখিব! যখন রোগ-শোক-দুঃখ আসিয়া ব্যাকুল করিবে, তখন ওই মুখখানি দেখিব। যখন কোমল আকাশে তুমি উঠিয়া, আজিকার মতন এমনই সৌন্দর্য্য ছড়াইবে, তখন তোমাকে দেখিব, একবার ওই [illegible]খানি চাহিয়া দেখিব! যখন সংসারের কদর্য্য দেখিয়া দে[illegible]। চক্ষে শেল বিঁধিবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া লইব। যখন 'বাল্যসুখস্বপ্ন সকল আবার জাগিয়া উঠিবে, বাল্যক্রীড়ার সঙ্গীদিগকে মনে পড়িবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া, ওইখানে সে সকল সমবেত দেখিব। যখন পরলোকের চিন্তা আসিয়া উদয় হইবে, তখন আবার ওই মুখখানি দেখিয়া ভরসা বাঁধিব। যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া ওই চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিবে, তখন একবার ওই মুখখানি

দেখিয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব শিখিব। আর যখন স্নেহময়ী, ভক্তি-প্রীতিময়ী ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতাময়ী রোগীর রুগ্নশয্যার শিয়রে বসিয়া, পরের জন্য আপনাকে ভুলিয়া যাইবে, তখন আবার ওই মুখখানি চাহিয়া দেখিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপদেশ লইব। ইহার অধিক প্রতিদান আর চাহি না। ইহার অধিক সুখ আর কি আছে। এমন পবিত্র নিধিকে যে বিলাসের উপকরণ মনে করে, রমণীকে যে জঘন্য পশুবৃত্তিচরিতার্থতার সামগ্রীমাত্র বলিয়া জানে, সে মূর্খ, সে নীচ, সে মনুষ্যনামের কলঙ্ক, সে নরাকারে পিশাচ। কিন্তু শশধর। তোমার কাছে কি বলিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি।

ঐ ত জ্বালা! দিবানিশি ভোর করিয়া রাখিয়াছে। আমার মন, কি জানি কি আনন্দে, কি জানি কি দুঃখে, কি জানি কি অবসাদে, চিন্তাতরঙ্গিণীতে সাঁতার দিতে পারে না ত, কেবল স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যায়। কি জানি কেমন চাঁদই যে হৃদয়াকাশে উঠে, সে দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া যায়। ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিয়া যায়, তখন আমি আবার আমার মন পানে, একমনে চাহিয়া থাকি। মনে হয়, বুঝি হারাইলাম। বোধ হয়, গেল গেল। মনের উপর স্বত্ব—তাহা ত অনেক দিন গিয়াছে; অধিকারটুকু আছে, তাও বা হারাইলাম! ঐ ত সংসারের কু। জিনিস হারাইয়া যায়। অতি যত্নে রাখিলেও

জিনিস হারাইয়া যায়। চক্ষে চক্ষে রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। বুকে করিয়া রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। আবার এ দুর্গম অরণ্যে—এ গভীর সমুদ্রে জিনিস হারাইলে, তাহার খোঁজই হয় না। যখন এ সংসারপ্রবাসে আসিয়াছিলাম, তখন জননী প্রকৃতি, কত কি সঙ্গে দিয়াছিলেন—সরলতা, সহজ-প্রফুল্লতা, স্থিতিস্থাপকতা, উৎসাহ, বিশ্বব্যাপিনী আশা, লীলাময়ী কল্পনা। প্রবাসে পাছে দুঃখ পাই বলিয়া কত সুখের সামগ্রী সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে সব হারাইয়া গেল—এক এক করিয়া নহে, একেবারে সব গেল—সব ফুরাইল। সব যায়, কিছুই ত থাকে না—ফিরিয়া যাইবার সময় কেবল প্রবাসযাতনার কাহিনী লইয়া যাই। জগদীশ! তুমি না কি মানবের পিতা? কিন্তু সন্তানের জন্য পিতার যে স্নেহ, তাহা তোমার কৈ? জগৎ-সংসারে এত দুঃখ দিয়াছ কেন? বিরহশ্বাস দিয়া মানবহৃদয় গড়িয়াছ কেন? কেবল রোদনের অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এ রঙ্গভূমিতে পাঠাইয়াছ কেন? তুমি দয়াময়। তুমি ইচ্ছাময়। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। অন্যে কি ভাবে জানি না; কিন্তু আমি ইহা বুঝিতে পারি না; দয়া, ইচ্ছা, শক্তি—তবে সংসারে দুঃখ কেন? সংসারে যে দুঃখ আছে, তাহা ত আর কেহ অস্বীকার করিবে না; সুতরাং ও তিনটি কথাই ভুল। তিনি দয়াময় হইলে, আমরা যখন দুঃখের ভারে মরিয়া যাই, তখন অবশ্য আমাদের দুঃখ-বিমোচনের ইচ্ছা করিবেন—নতুবা

আর দয়া কি? দুঃখীর দুঃখমোচনের ইচ্ছাই দয়া। সে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকিলে অবশ্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য কার্য্যে পরিণত হইবে। তাহা হয় না, মনুষ্যের দুঃখ ঘুচে না, যে যাহার ভিখারী, সে তাহা পায় না; তাহাতেই বলি, তিনি সে ইচ্ছা করেন না। তিনি কিসের দয়াময়? আর যদি তাঁহার ইচ্ছাসত্ত্বে আমাদের দুঃখ দূর না হয়, তবে তিনি কিসের ইচ্ছাময়? কিসের সর্ব্বশক্তিমান্? কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

জিনিস হারাইয়া যায়। হারাইলামই বটে। কিছুই ত একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিছুরই ত ধ্বংস নাই। এ বিশ্বে, আজ যাহা উপস্থিত আছে, তাহা চিরকালই ছিল। এক পরমাণুর ন্যূনাধিক্য নাই—কেবল সংযোগের বিশ্লেষমাত্র—কেবল সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়। হরি হে! সম্বন্ধ ছুটিয়া যায় কেন? যায় ত একেবারে যায় না কেন? তাহার পর আবার অন্য সম্বন্ধ হয় কেন? সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়, আবার দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কেন? ঐ সঙ্গে সকল সম্বন্ধ মিটিলে ভাল হয়।

পূর্ণিমার শশি, আর একদিন—এখন সেই দিন নাই—আর কখনও যে হইবে, সে আশাও নাই—বহুদিন হইল, আর এক দিন, মুক্তবাতায়নপথে এমনই হাসিয়া হাসিয়া, ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া ঘরময় পড়িয়াছিলে, আমার শরীরময়

পড়িয়াছিলে, আমার প্রাণময় পড়িয়াছিলে। আর কিছুতেই কি পড় নাই ? তবে অত সুন্দর, অত শীতল, অত প্রেমময়, অত পবিত্রতাময় লাগিয়াছিল কেন ? আর যত দুঃখ থাক্, তখন একা নই। তোমার হাসি যে বেশ মধুর, এ কথা শুনাইবার লোক ছিল। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, যাহার দিকে চাহিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইতাম, সে এখন নাই। আজি আমি একা। এ জগৎসংসারে আর আমার জুড়াইবার স্থান নাই। একজনের অভাবে সব অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সেই একদিন, আর এই একদিন। ইহারই মধ্যে কত কি হইয়া গেল। ঈশ্বরের দয়ার বালাই লইয়া মরি ! কত কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল, কত কুরঙ্গনয়নে অশ্রু ঝরিল, কত বিম্বাধর শুকাইয়া উঠিল, কত জীবন অন্ধকার হইল, কত হৃদয় শূন্য হইল, কত আলোক নিবিয়া গেল, কত নক্ষত্র অদৃশ্য হইল, কত চাঁদ—তোমার অপেক্ষা কত ভা[illegible] চাঁদ অস্তমিত হইল, কৈ আর উঠিল না ! তুমি চাঁদ, যাও, আইস, আবার যাও, আবার আইস। আমাদের হৃদয়াকাশের চাঁদ যায় —জন্মের মতন যায়—আর ফিরিয়া আইসে না। এই মধুর সময়ে প্রাণাধিকে, একবার এসো দেখি রে ; এই মধুর জ্যোৎস্নার উপর মধুরতর জ্যোৎস্না ফুটাইয়া, চক্ষের আগে একবার দাঁড়াও দেখি রে ! সেই যে হাসি অধর হইতে পলাইয়া গিয়া নয়ন-প্রান্তে লুকাইত, সেই ভুবনভুলান হাসি একবার হাস দেখি রে ! সেই যে কণ্ঠধ্বনি, যাহার প্র[illegible]-তরঙ্গ কর্ণবিবর

দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ভিতর ইওলীয় বীণা বাজাইয়া দিত, সেই কল-কণ্ঠে একবার কথা কও দেখি রে! সেই যে দৃষ্টি, যাহার সৌন্দর্য্য জগৎসংসারকে সুন্দর করিত, সেই দৃষ্টিতে, এ-দগ্ধ-হৃদয়ের উপর একবার অমৃত বর্ষণ কর দেখি রে! সেই যে লাবণ্যলীলা, সায়াহ্ণগগনের ন্যায় পলকে পলকে নূতন নূতন শোভা ধারণ করিত, সেই শোভায় এ তাপিত প্রাণ একবার জুড়াও দেখি রে! এত ভালবাসায় যে বিচ্ছেদ হইবে, ইহা কখনও মনে ছিল না। তোমা ছাড়া হইয়া যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানি না। কিন্তু শশি, মেঘের অন্তরালে লুকাইলে কেন? দেখ, আমার হৃদয়াকাশে একখানি করাল জলদ দেখা দিয়াছে—কখনও গর্জ্জে না, কেবল অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। দুঃখ হইলে পৃথিবীর লোক কাঁদে আমি কাঁদিতে পাই না; চক্ষের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—হৃদয়ের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—একবিন্দু জল নাই। অশ্রুপ্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে না কি, কাঁদিতে পাই না। তাই মরিতে ইচ্ছা হয়। তোমার শুভ্র-রশ্মিতরঙ্গে ডুবিয়া মরা হয় না? মেঘে মুখ ঢাকিয়া রহিলে যে? এই অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ডুব দেওয়া হয় না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না অপেক্ষা এই অপরিস্ফুট কৌমুদী, এই ঈষদন্ধকারযুক্ত জ্যোৎস্না, আমি বড় ভালবাসি—আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে ভাল। কিন্তু শশাঙ্ক, আর কি মুখ খুলিবে না? তবে আর কি জন্য বসিয়া থাকি? এখন যাই। এত যখন মনের কথা হইল,

তখন আর ভুলিব না—আবার সময় পাইলেই তোমাকে দেখিতে আসিব। এমনই সংগোপনে আসিয়া দেখিয়া যাইব। কেবল চক্ষের দেখা—তা চক্ষের দেখাই দেখিয়া যাইব। সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষুতে আনিয়া, একবার—একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া যাইব! আমার এ দুঃখময় জীবনে, ঐ সুখ! এমনই মৃদুপবনে, এমনই নির্জ্জনে, এমনই গভীর নিশায়, এমনই নীরবে, এমনই করিয়া একা আসিয়া তোমায় দেখিয়া যাইব। একা আসিব, কেন না, দুঃখ স্বার্থপর—কেন না, যে দুঃখী, সে নির্জ্জন ভালবাসে। আর যে দিন বড় সুন্দর সাজে সাজিবে, সোহাগের বড় বেশী ছড়াছড়ি করিবে, সে দিন ঐ সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে সঙ্গে সঙ্গে একবার কাঁদিয়া যাইব। রোদনে যে এত সুখ, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। যে না জানে, সে আছে ভাল। জানি না, কত দিনে এ হাহাকার ঘুচিবে! হায়! এ—

"হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কি দিলে হইবে ভাল।"

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

শ্মশানে

এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালী; এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল রুসো বল, রামমোহন বল; কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই! এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলেরই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার, আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে—তুমি আমি কে?

যে উৎকট অভিমান, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, * তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, † তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে-সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য রজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী, সে অনির্ব্বচনীয়া, এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নারীহৃদয় জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগালকুক্কুরে াঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে—আমি এতটুকু—আমি কি? এই মাটীর পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে

* See Lewe's History of Philosophy. Auguste Comte.

† See J. S. Milt's Three Essays on Religion.

সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেন জীবনের ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া, মুখের গ্রাস ভোজনপাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনিও এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি তাহা জানি না—কখনও দেখি নাই, হয় ত কখনও দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ, জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতা ; তাহার ক্ষুদ্রত্ব অনুমিতি হয়। সম্মুখে অসীম জলরাশি অনন্তপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে ; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত—আমি অতি ক্ষুদ্র—কত সামান্য। এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এই বিভ্রাট, এত পাপ ! বড় লজ্জার কথা। এই ক্ষুদ্রকে

কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায় ? কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি ; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র ; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ। মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে—স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে,সেদিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেন না আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিসের সমাধি হয়। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়।* আবার

* দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; শারীর এবং মানস। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ

তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহার সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয়, তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি, এ স্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ; যে পড়িয়া থাকে, তার দুঃখ! এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ! কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে; * রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশও আছে; রমণী-হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে; ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌননির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও † করে। জগতে

(রোগাদি), তাহার নাম শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিষাদ এবং বিষয়বিশেষের অদর্শন-নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম মানস-দুঃখ। উভয় শ্রেণীরই এ সকল দুঃখ, আভ্যন্তরীণ হেতু সমুদ্ভূত বলিয়া, ইহাদের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাহ্যহেতুসমুদ্ভূত দুঃখও দ্বিবিধ—আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত যে দুঃখ, তাহাই আধিভৌতিক। যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

* Sunstrok, See Tanner's Practice of Medicine, Vol. 1. page 375.

† The Grecian poet, Theogenis, who lived 550 B. C. clearly saw that wealth often checks the proper action of sexual selection. He thus writes—

কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভালমন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। * কিন্তু কি বলিতে বলিতে, কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান! চিরবহমান কাল-স্রোতেঃ দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে? পূর্ব্ব-

---

But in the daily matches that we make,
The price is everything; for money's sake,
Men marry, Women are in marriage given;
The churl or ruffian, that in wealth has thriven.
May match his offspring with the proudest race;
Thus everything is mixed, and noble and base!
If then in outward manner, form and mind.
You find us a degraded motley kind,
Wonder no more, my friend! the cause is plain,
And to lament the consequence is vain."

See Darwin's Descent of Man, Part, I. Chap II.
Also Part. III. Chap, XX.

যৌন নির্ব্বাচন—Sexual Selection.

* Attraction and Resistance of matter. This theory originated with Laplace; It has been expounded by Herbert Spencer.

মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না—এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল-সংসার খুঁজিয়া দেখিও কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্সপীয়র গিয়াছেন, হ্যামলেট আছে; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতাধ্বজা আজও উড়িতেছে। রুসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে অকীর্ত্তিও থাকে। লর্ড নর্থব্রুক যাবেন,কিন্তু লক্ষ্মী রাণীর চক্ষের জল শুকাইবে না, বরদার দুঃখশ্বাস মিলাইবে না। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্সপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।* কিন্তু তাঁহারা

* M. Villemain says—"Every year, it is stated, he went, during the summer, to spend some of his time at Stratford, with his wife and children and his aged father. The poet's taste for the beauties of nature, his vivid impression of the green landscapes of England would alone indicate that he was in the habit of seeking

লোকের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

"ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়,
পর উপকার সে লাভ।"

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব—ধর্ম্মের মূল ভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ-সোপান। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?

এই সংসার মহাশ্মশান! যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে, এমন জিনিস নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অল্লান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই?" নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে,

rural repose. In his own time, however, another motive was attributed for these frequent voyages; it has been stated that, on the road to his native place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford, the hostess of which remarkable for her elegance and beauty, became the mother of the poet, Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was godfather to this child, who was said to belong him by a closer tie and who subsequently took a singular pride in boasting of his descent. We are better able to understand after this the zeal of the royalist Davenant for the republican Milton. It was doubtless in his eyes a double debt of poetic parentage." See Alfonso de Lammartine's Biographies and Portraits of some Celebrated People Vol. I. Essay on Shakespeare. See also Richardson's Life of Sir William Davenant &c. &c.

কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলেও শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে। সংসার-জ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌন-নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, সুস্থ-মনে, অক্ষত-শরীরে কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই! এই অনন্ত জীবসমূহ, এ মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি-হাসি মুখে কখনও কি বিষাদচিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্ররাজির সোহাগের মৃদু-কম্পনে কখনও কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল-নিনাদে কখনও কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনীতে কখনও কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন, সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো!

হায়! এমন করিয়া আর কতদিন পুড়িব? কত দিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে? আর কখনও কি তোমায় পাইব

না? আজ হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, জন্ম-জন্মান্তরে হউক, যুগযুগান্তরে হউক—আর কখনও কি তোমায় পাইব না? না পাই, ভুলিতেও কি পাইব না?

মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকত-শয্যায় শেষ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব—হয় ত এ অনল নিবিবে—হয় ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে বলিয়া, সময়ে সময়ে মরিতে সাধ হয়। আবার তাও বলি, তাহাকে ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিবে, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মরিতে পারি না! এ জন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহা ত জানি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে ত জাগিতেছে! সে যেখানে আছে, সে স্থান পবিত্র—সে মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন? তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায়! সে যতক্ষণ চিন্তার বিষয়, সে যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক্। বড় যন্ত্রণা পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জন্য যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্য-জন্মে ধিক্। এই ছাই ভালবাসায় ধিক্! ধিক্ এ প্রাণে! ধিক্ এ-ছার প্রণয়ে! ধিক্ পরিণয়ে! কিন্তু—হয় ত আবার তাহাকে পাইব। হয় ত পরলোকে, তাহাতে আমাতে আবার এক হইব! জাগতিক পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্যে হয় ত সেই মাটীতে এই মাটীতে একত্রে মিশিতে পারে—সেই বরবপুও পরমাণুর সঙ্গে,

এই পোড়া মাটীর পরমাণুর সঙ্গতি ঘটিতে পারে! দুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনঃ সমবায় হইয়া, নূতন এক সত্তা সৃষ্ট হইতে পারে! তাই বলি, পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয় ত এক হইব। বম্ ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, হৃদয়ের যে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে—সংসারের যে কুহক, জীবনের যে ভেল্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে সেই, তাহাতে আর আমাতে—সংসারান্ধকারে যে চাঁদ, জীবনমরুভূমে যে ওয়েসিস্, ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পান্থশালা, তাহাতে আর আমাতে—পৃথিবীর যে সার, স্বর্গের যে নমুনা, ইহলোকের যে সর্ব্বস্ব, পরলোকের যে ততোধিক, তাহাতে আর আমাতে—গৃহকুঞ্জের সেই সুখলতা, চিন্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল-নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে—সংসার-প্রবাসের সেই স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন-মরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হৃদয়কাননের সেই বিকচ কুসুম, তাহাতে আর আমাতে—আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় যে কবিত্ব, দুঃখে যে সান্ত্বনা, সুখে যে সে—যা—তাই, তাহাতে আর আমাতে হয় ত আবার মিলিত হইব। সে মরিয়া মাটী হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটী হইব। দুই মাটীতে এক হইবে। আমার দেহের পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংঘটন ঘটিবে;

তাহাতে আমাতে এক হইয়া এক নূতন সত্তার অভ্যুদয় হইবে। যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু কি সুখের মিলন। কি সুখের সংঘটন! আমার সেই আদরিণী, সোহাগের সেই সোহাগিনী, অতীতের কোমল আশের সেই ইন্দ্রধনু, উপস্থিতের আঁধার-গগনের সেই সৌদামিনী—কেমন বুকভরা মিলন। দুইজনে এক হইয়া এক নূতন সত্তা হইব—আ মরি রে! কি সুখের সমবায়! জীবের দেহান্তর প্রাপ্তিতে কোন মূর্খ সন্দেহ করে? আত্মার শরীর পরম্পরায় স্থান অসম্ভব কিসে? আত্মা কি? শরীরযন্ত্রের গতি মাত্র। তাই বলি, শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণু আত্মা।* বিশ্লিষ্ট দেহবিশেষের অণুর দ্বারা দেহান্তর-সৃষ্টি, বিচিত্র কি? মানুষ মরিয়া বৃক্ষ হইতে পারে, তৃণ হইতে পারে, প্রস্তর হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে, নক্ষত্র হইতে পারে, পশু হইতে পারে, কীট হইতে পারে। পিথাগোরাস্ পূর্ব্বজন্মে এজাক্স ছিলেন, ইহা বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালী সাহস করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না,

---

* হার্বর্ট স্পেন্সর বলেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ক্ষুদ্র একবিন্দু বীর্য্য হইতে সন্তান উৎপন্ন হয় এবং সেই বীর্য্যবিন্দুসমুদ্ভূত সন্তান পিতার রোগ, পিতার আকৃতি, দোষ-গুণ প্রাপ্ত হয়। সার্ গাল্টন তাঁহার "Heriditary Genius" নামক পুস্তকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রতিভা পর্য্যন্ত আমরা পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই; সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐ বীর্য্যবিন্দুতে পিতার মানসিক এবং শারীরিক উভয় প্রকৃতিই আছে। যিনি এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন, তিনি বোধ হয়, আমাদের উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞায় আপত্তি করিবেন না।

তাহার শরীরে একিলিস্ অথবা সেকেন্দরের, সিজর অথবা হানিবলের, নেপোলিয়ন অথবা ইপামিণ্ডাসের, ব্রাসিডাস্ লাইসাণ্ডারের, ভীমের অথবা অর্জ্জনের দেহাংশ থাকিতে পারে। রামের শরীরে, হয় ত কালডেরন্ অথবা লোপ্ ডি ভেগার, গেটে অথবা শীলারের, পেট্রার্ক অথবা ডাণ্টের, কর্ণেলী অথবা রেসাইনের, সেক্সপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা বর্জ্জিলের, ব্যাস অথবা বাল্মীকির আত্মা আছে। শ্যামের দেহ, হয় ত স্কালিগার অথবা মেগ্‌লিয়াবেকির বিশ্লিষ্ট দেহের উপকরণে রচিত। এই যে হংসপুচ্ছলেখনী, ইহার ভিতর হয় ত ভল্টেয়ার অথবা রুসো আছেন। এই মসীপাত্রে হয় ত শাক্য-সিংহ অথবা কোমৎ আছেন। এই হৃদয় যাহার জন্য লালায়িত, এই হৃদয়ে হয় ত সেই আছে। মনুষ্য-দেহের আণবিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাত বৎসরে নব কলেবর ধারণ করে। সেই নিয়তবহমান পরিবর্ত্তন-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া হয় ত সেই দেহের পরমাণু এই দেহে মিশিতেছে। জগতে কিছু আশ্চর্য্য নহে। জগতে সকলই আশ্চর্য্য। যে গিয়াছে বলিয়া জগৎসংসার আঁধার হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে—যুগযুগান্তরে হউক, কল্পকল্পান্তরে হউক, সেই অকলঙ্ক চাঁদ আসিয়া আবার এ-গগনে দেখা দিতে পারে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। তাহাতে—সেই অমূল্য নিধিতে যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে।

কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সবই আছে, কেবল একত্রে নাই। সকল উপকরণ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে ; যে দিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন—মনে করিতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়—সেই দিন আবার সংসার-মরুভূমে সেই সুকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর কুসুম ফুটিবে—দশদিক আলো করিয়া জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত সৌরভ-তরঙ্গ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র-স্রোতে ধৌত করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নয়। জীবের দেহপরম্পরাসক্তি অসম্ভব নয়। হিন্দু-ধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা একেবারে ভ্রান্ত—এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। যে চিন্তাশীল, সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার উপযুক্ত হয়, ত সে হিন্দুধর্ম্ম। নিরাকার ঈশ্বর, হাসিবার কথা—দেহ-নিরপেক্ষ চৈতন্য জগতে কোথাও দেখি নাই ; যতদিন না দেখিতে পাই, ততদিন মানি না। ইচ্ছাময় জগৎকারণ, মুখের কথা—এক কারণের একই কার্য্য ; যে কারণ হইতে এই জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণ হইতে অন্যরূপ সৃষ্টি অসম্ভব! সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় ঈশ্বর, বাতুলের কথা ; আপন আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। একটি জীব পৃথিবীতে আসিবে—সে মরিয়া যাইতে পারে, সে অকর্ম্মণ্য হইতে পারে—সে পৃথিবীর ভারমাত্র হইতে পারে—কিন্তু কেবল

তাহার সংসার প্রবেশের জন্য, অপর একটি উৎকৃষ্টতর জীবকে * মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সে যাতনানিবন্ধন কোন ভাল নাই, কোন আপদ নিরাকৃত হয় না, কোন উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না, কাহারও সুখ বাড়ে না, কাহারও দুঃখ কমে না—তবু এই যমযাতনা ভোগ করিতে হয়! † নিরর্থক যাতনা দেওয়া যাহার অভিপ্রেত, সে নিষ্ঠুর, সে নির্দ্দয়—কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—সে আবার আসিতে পারে! সে গিয়াছে—জগতের মাধুরী হরণ করিয়া, হৃদয়ের পরতে পরতে আগুন জ্বালিয়া দিয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া, সুখের পাত্রে গরল ঢালিয়া দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাখাইয়া দিয়া, যে পলাইয়াছে সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমি পাগল হইলাম না কি? কোথায় সে কোথায় আমি? কোথায় সে ভালবাসা? কোথায় সে সুন্দর সংসার? কোথায় সে চির প্রেমোচ্ছ্বাসপরিপ্লুত হৃদয়? হায়, কেন মরিলাম না! চক্ষে ধূলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

* "Oh fairest of creation! last and best of all God's work's."
—Miltons *Paradise Lost. Book* IX.

† যাহা কিছু জগতে ঘটে, তাহা অবশ্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সন্তান প্রসবের সময় স্ত্রীলোকের যে প্রসববেদনা হয়, তাহাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সে দারুণ যাতনা নিষ্প্রয়োজন, কেন না তন্নিবন্ধনে কোনই লাভ দেখা যায় না, নিষ্প্রয়োজনে ক্লেশ দেওয়া নিষ্ঠুরের কাজ—সুতরাং ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

See J. S. Mill's *Three Essays on Reli* *On Nature.*

তখন কেন গরল খাইলাম না? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকারে দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথীসৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাতে শুইলাম না? সেই সোণার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাঁপ দিলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না?

হৃদয় মথিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাতরস্বরে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ডাকিলাম—'প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি? আমার অন্তরের আলোক, আমার বাহিরের অন্তর, আমার নয়নের মণি, আমার সকলের সব—আমার সবের সকল, জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি আমার কোথায়?' অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর-স্বরে অমনি মুখের উপর ডাকিয়া বলিল—'আর কোথায়।' আকাশে সেই কঠোর স্বর নাচিয়া নাচিয়া বলিল—'আর কোথায়।' দূরে সে কঠোর স্বর মিলাইতে না মিলাইতে বলিল—'আর কোথায়।' স্তম্ভিত হইলাম। মুহূর্ত্তেকর জন্য অন্তর্জ্জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। হায়! প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিতে পোড়া বিধাতাকে কে বলিয়াছিল?*

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব।

---

* "Hark to the hurried question of Despair.
"Where is my child?"—an Echo answers—"Where?"—Byron, *The Bride of Abydos.*

"I came to the place of my birth and cried. The friends of my youth, where are they?"—and an Echo answered, "Where are they?" From an *Arabic Ms.*—Byron's Note on the above couplet.

নব-বসন্ত-সমাগমে

আবার বসন্ত আসিয়াছে ; ফুলসাজে সাজিয়া স্বপ্নের ঢেউ লইয়া, আবার বসন্ত আসিয়াছে ; কিন্তু সে কৈ ? পূর্ব্বে ভালবাসিতাম, এখন ভালবাসি না, তাই বসন্ত আসিয়াছে ; ভালবাসা থাকিলে, হয় ত আসিত না। যাহাকে পূর্ব্বে ভালবাসিতাম, এখন ভালবাসি, চিরকাল ভালবাসিব, সে ত কৈ আসিল না! যাহাকে ভালবাসি না, সে আসিবে না কেন? —তা আসে—যাহাকে ভালবাসি, কেবল সে-ই আসে না। বৃক্ষে বৃক্ষে নব-পত্রোদ্গম হইল, শাখায় শাখায় নব প্রসূন ফুটিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর আসিয়া জুটিল, প্রবাহে প্রবাহে সুগন্ধ ছুটিল, নবীন শ্যাম শোভায় জগৎ মাতিল, কিন্তু—সেই শ্যাম শোভার মধ্যে যে শ্যাম শোভা, সে আসিল কৈ ? আশা আসিল কৈ ? উৎসাহ আসিল কৈ ? প্রফুল্লতা আসিল কৈ ? সুখের সেই চাঞ্চল্য আসিল কৈ ? সে মাধুরী আসিল কৈ ? আশায় যে আশা উৎসাহে যে উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সৌন্দর্য্যে যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যে যে মাধুরী, বসন্তে যে বসন্ত—সে আসিল কৈ ? ঋতুরাজ আবার জ্বালাইতে আসিয়াছে ? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—ইহাতেও কি কিছু পৌরুষ আছে ? দুঃখীর দুঃখ বৃদ্ধি করিতে

কে না পারে? যে সুখবৃদ্ধি করিতে পারে, সেই ধন্য! ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, যে গড়িতে পারে সেই মহৎ। কাহিনীতে শুনিয়াছি—রাজপুত্র, ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া মালিনীর মালঞ্চে লাগিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর যে মালঞ্চে ফুল ফুটে নাই, সে মালঞ্চ অকস্মাৎ ফলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! ঋতুরাজ, নিয়তিস্রোতে ভাসিয়া আজ এ মালঞ্চে লাগিয়াছে, কিন্তু ছুটিলাম না? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল কৈ? ভ্রমর গুঞ্জরিল কৈ? সোহাগিনী ব্রততী সৌন্দর্য্যভারে ভারি হইয়া ঢুলিল কৈ? প্রত্যেক সূর্য্যরশ্মিসম্পাতের সঙ্গে রূপের লহর উঠিল কৈ? প্রতি মৃদু সমীরণ-হিল্লোলে সৌরভ-তরঙ্গ ছুটিল কৈ? যাহা ফিরিয়া পাইলে সুখী হই, তাহা কৈ? প্রকৃতি অনেক জিনিস ফিরাইতে পারে, কিন্তু সকল পারে না। জড়জগতের অনেক জিনিস যায়, আবার ফিরিয়াও আসে কিন্তু অন্তর্জগতের যাহা যায়, তাহা একেবারে যায়—উড়িয়া যায়—ধুইয়া যায়—মুছিয়া যায়—জন্মের মতন যায়—কস্মিন কালেও আর ফিরে না। বসন্ত আবার আসিল, কিন্তু সেই চিরবসন্তময় আর আসিল না। হরি! হরি! জ্যোতিষ্কনিচয়, অনন্ত-বিস্তৃতিমধ্যগত, অনন্ত গগন-বিহারী, মৃৎপিণ্ড হইয়া গিয়াছে—স্বর্গের আলোক স্বর্গের পবিত্রতা, স্বর্গের শোভা পৃথিবীতে আনিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বলিয়া বোধ হয় না। কোকিল, পাখী হইয়া গিয়াছে—

ভ্রমণশীল স্বর * বলিয়া আর বোধ হয় না। এ সংসার, যন্ত্রণাকারাগার হইয়াছে—সুখনিকেতন বলিয়া আর বোধ হয় না। হৃদয়ের গূঢ়তম-প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া, গৃহ-কুঞ্জে কুসুম ফুটিল। মনে করিলাম, জীবন-বসন্তের এই প্রথম ফুল। আশা করিলাম, আরও কত ফুটিবে। নিদারুণ বিধাতা দেখাইল সেই শেষ ফুল। প্রেমের মালঞ্চে কেবল একবার ফুল ফুটে। আমার সাধের বসন্তে অকস্মাৎ শীত আসিয়া দেখা দিল! আমার বড় সাধের ফুল, অমনি মলিন হইয়া গেল। বড় সোহাগের কোকিল, কলকণ্ঠ বাজাইয়া কেবল উঠিতেছিল, অমনি নীরব হইল। বড় দুঃখের আশালতা অম্‌নি ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে যাইবার নয়, সে গেল—এ ছার প্রাণ ত কৈ গেল না! সমীরণ মৃদু মৃদু কাঁদিতেছে—হায় হায়! এই মৃদু পবনে কত দুঃখের ঢেউ, কত নৈরাশ্যকাতরতা, কত বিস্মৃত স্বপ্নপ্রবাহ, কত জন্মান্তরীণ অস্পষ্ট ভাব আনিয়া সে বুকের উপর চাপাইয়া দেয়, তাহা আর কি বলিব? সহসা কে যেন আসিয়া নিশ্বাসের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়—বহিঃস্থ বায়ু সহজে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না; একটা নিশ্বাস—একবার, দুইবার, তিনবারে টানিতে হয়।

---

* "O Cuckoo! shall I call the bird,
Or but a wandering voice?"
Again—
"Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing—
A voice, a mystery."—*Wordswoth*.

প্রাণ করে—ধূ, ধূ, ধূ! যে দিকে তাকাই, আগুন জ্বলিতেছে—ধূ, ধূ, ধূ! ধমনীতে ধমনীতে অনল জ্বলিতেছে—ধূ, ধূ, ধূ! প্রতি লোমকূপে, প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি শোণিত-বিন্দুতে, অনল জ্বলিতেছে—ধূ, ধূ, ধূ! আর এ পাপ হৃদয়ের ভিতর কি যে হইতেছে, তার আর কি বলিব? কালানল, প্রলয়ানল, নরকানল, অনলের অনলত্বরচিত অনল জ্বলিতেছে—ধূ, ধূ, ধূ!

সব লণ্ডভণ্ড করিয়া, সংসার শূন্য করিয়া, জীবন অন্ধকার করিয়া, অধমকে এমন করিয়া নাজেহাল করিয়া যাওয়া—এ ত তোমার মতন কাজ হয় নাই, প্রাণাধিকে! তোমাকে মনে পড়িলে, কোথায় চক্ষের উপর জ্যোৎস্না ফুটিবে, কর্ণবিবরে দিব্য সঙ্গীতহিল্লোল প্রবেশ করিবে, নাসিকায় [illegible] আসিয়া লাগিবে, হৃদয়ের উপর অমৃতবর্ষণ হইবে, অমর হইতে সাধ যাইবে; কি না দুঃখ হয়—এ ছার প্রাণ যায় না কেন? কি না সাধ হয়—এ মাটীর দেহ, এ মাংসাস্থিশোণিত স্তূপ পরিহার করিয়া সায়াহ্ন সমীরণ হই! সমীরণ হইয়া বনে বনে, গহনে গহনে, তীরে তীরে, কুঞ্জে কুঞ্জে, কুসুমে কুসুমে, আকাশে আকাশে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, যেখানে যেখানে সুন্দর কিছু দেখিতে পাইব, সেই সেই স্থলে মনের দুঃখে গড়াই! কি না লালসা হয়—মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া, পাপিয়া হইয়া নীল-গগনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিরহসঙ্গীত-ধ্বনিতে ভরিয়া দি। দেখ দেখি কি হইয়াছে প্রাণাধিকে! আমার প্রাণ যে কেমন

করে, তাহা কেবল আমিই জানি। পরের বেদনা পর বুঝে না। আমার হৃদয়ের ভিতর কি যে হইয়াছে, তাহার সাক্ষী আমার হৃদয়।

জানি না, কোন্ পাপে রাবণের চিতা বুকে করিয়া বহন করি। জানি না, কোন্ পাপে জীবমাত্রের জীবন দুঃখের জীবন হইয়াছে। জানি না, কোন্ পাপে অন্তরে বাহিরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ভালবাসা কি পাপ? প্রণয় কি দোষাবহ? তাহা ত নহে। প্রণয়কে যে দোষাবহ মনে করে, সে মূর্খ, মহামূর্খ, গণ্ডমূর্খ, গোমূর্খ, হস্তিমূর্খ। মনুষ্যজীবনের যত কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, প্রণয় সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। পরবর্ত্তী কালের মনুষ্য-প্রকৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রণয়সংঘটনা-সাপেক্ষ। কেবল ব্যক্তি-বিশেষের বলিয়া নহে, মনুষ্যজাতির শুভাশুভ এই প্রণয়ের উপর নির্ভর করে!*

তাহাতেই বলি, প্রণয় ধন্য—প্রণয় নমস্য—প্রণয় পূজ্য—প্রণয় ধর্ম্ম—প্রণয় দেবত্ব—প্রণয় ঈশ্বরত্ব। স্বার্থত্যাগ যদি দেবভাব হয়, তাহা হইলে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রণয় ব্যতীত আর কোথায়ও দেবভাব দেখি নাই; প্রণয় ব্যতীত অন্য

---

* The final aim of all love intrigues, be they comic or tragic, is really of more importance than all other ends in human life. What it all turns upon is nothing less than the composition of the next generation. It is not the weal or woe of any individual, but that of the human race to come, which is here at stake.—*Schopenhauer*.

দেবত্বও স্বীকার করি না। কেবল ইহাই নহে। মনুষ্যের অনেক মহৎ কীর্ত্তি প্রণয়মূলক! সঙ্গীত-বিস্তার মূলে প্রণয় আছে; * ভাষার মূলে প্রণয় আছে। কিন্তু কি লিখিতেছিলাম, † ভুলিয়া গেলাম—কি জন্য দারুণ যাতনা সহ্য করি? যাঁহারা বলেন, এ সংসার পরীক্ষার স্থান, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। পরীক্ষা কিসের? ঈশ্বর যেমন করিয়াছেন, আমরা তেমনই হইয়াছি—কিসের জন্য পরীক্ষা? সৃষ্ট পদার্থের গুণাগুণের পরীক্ষা দ্বারা কেবল স্রষ্টার ক্ষমতার পরীক্ষা হয়! আমার ঘড়িটি যদি অল্প কারণে

* Mr. Darwin thinks that "musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the opposite sex." Herbert Spencer concludes that the cadences used in emotional speech afford the foundation on which music has been developed. But the question arises why were cadences used in emotional speech?—and we may adopt Darwin's explanation for want of a better. If mankind acquired musical notes for the sake of charming the opposite sex musical notes would of necessity be firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling, and would consequently be used instinctively, or through association when, strong emotions were expressed in speech.—Darwin's *Descent of Man, Part III, Chapter XIX.*

† This is also Darwin's opinion, He says—We may believe that musical sounds afforded one of the bases for the development of language,

Lord Monbodo in his 'Origin of Language' says that Dr. Blacklock thought that "the first language among men was music and that before our ideas were expressed by articulate sounds, they were communicated by tones, varied according to different degrees of gravity and acuteness.

বিগড়াইয়া যায়, তাহাতে ঘড়ির অপরাধ কি? এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নির্ম্মাতা কুশলী নহেন। আমাদের পাপের জন্যও ঈশ্বর আমাদিগকে দায়ী করিতে পারেন না। আমাতে যাহা আছে, আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে, সব তিনি করিয়াছেন—এ হৃদয় তুমি গড়িয়াছ, এ সংসার তুমি গড়িয়াছ; হৃদয়ে সংসারে যে সম্বন্ধ, তাহারও সংস্থাপক তুমি—তবে আমাদের পাপ কি? যদি পাপ থাকে তাহার দায়ী কে? তুমি না আমরা? আমাদের পশুভাব অনেকটা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু আমাদিগকে পশু অথবা পশুর অতি নিকট কুটুম্ব করিয়াছ কেন? * কিন্তু মরুক্ ছাই। দুঃখীর মুখ কি কেহই তাকাইতে জানে না? এমনই ত মনের দুঃখে মরমে মরিয়া আছি, তাহার উপর আবার সহকার-শাখায় বসিয়া পঞ্চমস্বরে কোকিল ডাকিতেছে—কুহু। কি জানি কেন ঐ কুহুরব—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

ঐ যে কোকিল, উহার রব শুনিলে প্রাণটার ভিতরেও যেন কোকিল ডাকিয়া উঠে। কিন্তু একবার বৈ আর ডাকে না—

* Without question, the mode of origin and the early stages of the development of man, are identical with those of the animals immediately below him in the scale; without a doubt in these respects, he is far nearer to apes than apes are to the dog.—Huxley's *Man's Place in nature.*

The reader I presume is already acqainted with Darwin.

একবার সাড়া দিয়া, অমনি নীরব হয়। আবার বাহিরে তরুশাখায় বসিয়া তীব্র পঞ্চম * স্বরে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া, কোকিল ডাকে—কুহু। এই সমীরণ—বাল্যস্মৃতির ন্যায়, বিরহীর হৃদয়ের ন্যায়, কালিদাসের প্রকৃতি-বর্ণনের ন্যায়, এই মৃদু সমীরণের ন্যায়—এই মৃদু সমীরণ সেই কুহুরব আনিয়া কান ভরিয়া ঢালিয়া দেয়। বুকের ভিতর অমনি প্রতিধ্বনি হয়—উহুঃ। শুন নাই কি প্রতিধ্বনি হয়—আবার বহু দূরে সেই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়? বুকের ভিতর প্রতিধ্বনি হয়—উহুঃ। আবার দূরে, বহুদূরে—বুকের ভিতর বুক, তাহার ভিতর যে বুক আছে, সেইখানে সেই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ডাকে—উঃ—উঃ—উঃ। এই মৃদু পবনই ওঁ কু। কেমন স্বপ্নের ঢেউ আসিয়াই যে গায়ে লাগে, স্মৃতি অন্ধকারের ভিতর কত আলোক ঝিক্‌মিক্ করিয়া ওঠে — পূর্ব্ব দিনের সুখ-স্বপ্ন সকল এক এক করিয়া জাগিয়া উঠে—মনের ভিতর কেমন এক অপূর্ব্ব কলনিনাদিনী স্রোতস্বতী মৃদু কলকলস্বরে প্রবাহিত হয়। তাহাতে সেই অতুল মুখখানি, সেই "সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন" নির্ম্মিত মুখখানি, চকিতের ন্যায় ভাসিয়া, দেখিতে দেখিতে

---

* সুরের পঞ্চমকেই লোকে মধুর বলে, কিন্তু আমি এ কথার অনুমোদন করি না। পঞ্চম বড় তীব্র—মিষ্টতা আছে, কিন্তু মধুর মিষ্টতার ন্যায় বড় উগ্র। আমার কর্ণে গান্ধারই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।"

অমনি ভূ-উ-স করিয়া ডুবিয়া যায়। ছোট বড় ঢেউ মাত্র গোটাকতক দেখিতে পাই।

এই যে বসন্তের চাঁদ—আ মরি মরি! এই ঢুলু ঢুলু ভাব বড় ভালবাসি। শরতের চাঁদকেই লোকে সুন্দর বলে, কিন্তু—উহার হাসি বড় প্রখর, বড় ব্যঙ্গসূচক, বড় মর্ম্মভেদী। অত হাসি সকলের ভাল লাগে না। আমার মতন যার অদৃষ্ট, তার বড় কঠিন বাজে। আর এই যে ঈষদন্ধকার জ্যোৎস্না, এই যে নিদ্রিত জ্যোৎস্না, এই যে স্বপ্নমাখা জ্যোৎস্না, ইহার কাছে সে ছাই। এই [illegible] অঙ্গে পড়িলে, আমার সেই প্রাণের অধিক ধন স্মৃতির দ্বারে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়ায়। সেই মধুর হাসি—যে হাসিতে মনের অন্ধকার দূর হয়, সংসারের মুখ সুন্দর দেখায়, স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তি হয়, মানুষের প্রতি অনুরাগ হয়—যে হাসি দেখিলে সহৃদয়তা জন্মে, অপবিত্রতা দূর হয়, অসৎ প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়, মনের মালিন্য কাটিয়া যায়—সে মধুর হাসি দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাকে ত একবার দেখিতে পাই, এবং তাহাকে দেখাই সুখ! যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার ছায়া দেখিলেও সুখী হয়। সেই চাঁদ-মুখখানি, মনে মনে ঠিক করিয়া আনিতে পারি না বটে, মানস-পটে অবিকল আঁকিতে পারি না বটে, কিন্তু বলিয়াছি ত—তাহার ছায়ামাত্র ভাবিয়া যে ভাবহিল্লোল বহে, তাহাতেই বিভোর হইয়া যাই। এই স্থলে বিশ্বরচনার একটু কারিগরি দেখিতে পাই—যে

যাহাকে ভালবাসে, সে তার মুখাবয়ব মনে আনিতে পারে না। এমনই চ'ক্ষের জলে পথ দেখিতে পাই না, তার উপর আবার যদি সেই কুহক-মাখা মুখ নিরন্তর চ'ক্ষের উপর ভাসিয়া বেড়াইত, তবে আর বাঁচিতাম না। ইহাতে কারিগরের বাহাদুরী কতটুকু, তাহা সেই কারিগরই জানেন, কিন্তু ইহার কারণ দুষ্প্রাপ্য নহে। কথা কি জান, সকল অঙ্গ একত্রে কখনও দেখা হয় নাই। দুইটা বৈ চক্ষু নহে ; যখন যে অঙ্গে পড়িয়াছে, তখন সেই অঙ্গেই মজিয়া গিয়াছে—সেই অঙ্গের অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য-হিল্লোলে ডুবিয়া গিয়াছে! দুইটা অঙ্গ একত্র করিয়া কখনও দেখা হয় নাই। এইজন্য এমন হয়—সে অধরপল্লব দু'খানি মনে করিতে পারি, সে চক্ষু দু'টি মনে করিতে পারি, সে অতুল ললাট মনে করিতে পারি, সে অপূর্ব্ব নাসা মনে করিতে পারি : সেই অধরে সেই হাসি, তাহাও মনে করিতে পারি ; সেই চ'ক্ষুতে সেই দৃষ্টি তাহাও মনে করিতে পারি ; সেই ললাটে সেই অপূর্ব্ব গরিমা, তাহাও মনে করিতে পারি ; কিন্তু সেই মুখখানি মনে আসে না। এক এক করিয়া সকল অঙ্গই মনে আসে, কিন্তু সকল অঙ্গ একত্রে মনে আসে না—এক এক করিয়া সকল অঙ্গ দিনান্তে সহস্রবার দেখিয়াছি ; সকল অঙ্গ একেবারে কখনও দেখা হয় নাই। আর এক কথা, মুখের কেমন যে অপূর্ব্ব ভাববিকাশ—আকৃতিতে গঠন ডুবিয়া থাকিত!

স্বপ্নে যে একদিন দেখিব, সে সুখও কখন অদৃষ্টে হইল না। প্রায় নিতুই মনে করি, জাগিতে হউক, ঘুমাইতে হউক, একবার যদি তাহাকে দেখিতে পাই! কিন্তু এ জগতে কেমন নিষ্ঠুর নিয়ম, এ জন্মে আর কখনও তাহাকে দেখিলাম না। কেন দেখিতে পাই না? সতত যাহাকে ভাবি, ভাবিতে ভালবাসি, যাহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত, তাহাকে দেখিতে পাই না কেন? লোকে বলে, যে বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়। ওটা মিথ্যা কথা। * স্বপ্নই হউক,

* "Sir William Hamilton in his 'Lectures on Metaphysics, mentions the facts, but I do not remember him to have attempted an explanation anywhere. The explanation, however, is not far to seek. Dreams are effects, and as effects they must have some antecedent cause. This cause we find in perception, because perception is never wholly suspended. Leibnitz tells us that even when we sleep without dreaming there is always some feeble perception. The art of awakening, inded, shows this." Now, if the reader will admit our perception to be the ground-work of our dreams, the whole thing becomes as plain as c, a, t, cat. There is law everywhere and in every thing. Even in sleep ideas connot follow one another except in obedience to the laws of association, or the one ground law, hinted at by Aristotle and clearly laid down by Augustin. Now, our ideas of those whom we love most are associated for the most part with our feeling of a particular clase only, and as past feelings can never be the subject of perception, those whom we love find no place in our dreams. This explanation, however, needs further comment; but now I can devote no more space to such discussions. I have a mind to take up and attempt an elaborate exposition of this subject some other time.

আর অন্য কিছুই হউক, সবই নিয়মাধীন। স্বপ্নেই হউক আর জাগ্রতাবস্থাতেই হউক, ভাবসাহচর্য্যের নিয়মানুসারে ভাবানুস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। যে দুইটি ভাব পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ, তাহার একটি আসিলেই, অপরটি আসিবে। যে বৃক্ষতলে বাল্যকালে খেলাধূলা করিতাম, সে বৃক্ষটি দেখিলে অথবা মনে উঠিলে, আবার সে সকল মনে পড়ে। সেই বাল্যকালে, সেই উপস্থিতোন্মাদ, সেই শূন্য চিত্ত, সেই ক্রীড়ার সঙ্গিগণ, সেই অনর্থক কলহ, সেই অনর্থক আত্মীয়তা, সেই অভিনব সংসার, সেই সুন্দর হৃদয়, সেই অকারণ রোদন, সেই অকারণ হাস্য—সেই সকল আবার জাগিয়া উঠে; কেন না, ইহারা পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ। বৃক্ষটি এবং শৈশবসুখদুঃখ, ইহার একটি যখন ভাবিয়াছি, অন্যটিকেও ভাবিয়াছি; সুতরাং একটির সঙ্গে সঙ্গে অন্যটি আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাকে ত কখনও কিছুরই সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ভাবি নাই। যখন তাহাকে ভাবিয়াছি, তখন কেবল তাহাকেই ভাবিয়াছি। সেই এক ভাবেই হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

সংসারে দেখিলাম, সুখ নাই। এ দারুণ দুঃখ যে কেবল আমি এই প্রথম সহ্য করিলাম তাহা নহে; কিন্তু গতানুস্মরণ আমার কাল হইয়াছে। দুঃখ আসিলেই ভোগ করি—দুঃখভোগের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছি—দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ছিল কি, আর হইল কি, এই তুলনায় বুক

ফাটিয়া যায়। * মরিব মরিব মনে করি, মরিতে পারি না। দুঃখের কথা বলিব কি, একদিন নৌকাযোগে কোথা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। ভাগীরথী-হৃদয়ে, মৃদুপবনহিল্লোলে, অন্ধকারসংশ্লিষ্ট জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্র-খচিত নীলচন্দ্রাতপতলে বসিয়া বসিয়া কত মাথামুণ্ড ভাবিলাম—সুখের অস্থৈর্য্য, দুঃখের পরিণাম, নৈরাশ্যের কাতরতা, স্নেহের ব্যাকুলতা, সংসারের গতি, মানবের দুঃখ, হৃদয়ের দশা, শৈশবের শূন্যচিত্ততা, নবযৌবনের চঞ্চলতা, আশার ছলনা, অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা, কত ছাই-ভস্ম ভাবিলাম। সে দিন, কি জানি কি তিথি, কিন্তু সেই চাঁদ উঠিতেছিল। চন্দ্ররশ্মি, অন্ধকারের সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে করিতে গঙ্গার জলে গিয়া পড়িতেছিল। ভাগীরথী, একবার ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া চাহিয়া, আবার আপন মনে চলিয়া যাইতেছিল। হেনকালে, দূরে—বহুদূরে মধুর-কণ্ঠে, টোড়ি-রাগিণীতে কে গাইল—

"গেল না কেন প্রাণ, সই রে, তাহার বিচ্ছেদে।" †

---

* "Could I forget
What I have been, I might the better bear
What I am destined to. I am not the first
That have been wretched; but to think how much have
been happier."
—Southern. *Innocent Adultery,*

† নিধুর টপ্পা। এ গানটির এই ছত্রটিই ভাল। অপরাংশ ভদ্রলোকের অশ্রাব্য। মন্দের মধ্য হইতে ভাবটুকু বাছিয়া লওয়া দোষের কথা নহে। সেদিন ঐ এক ছত্রই

মৃদু সমীরণ সেই সুধা কর্ণবিবর ভরিয়া ঢালিয়া দিল! বুকের ভিতর শব্দ হইল—দুপ্‌, দুপ্‌, দুপ্‌। কে যেন বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেল। প্রাণের ভিতর হইতে, প্রাণের কানে কানে কে যেন বলিল—জাহ্নবীর গর্ভ বড় শান্তিনিকেতন। মনে করিলাম, মরি না কেন? এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, জাহ্নবীর জলে ডুব দিয়া একবার তাহাকে খুঁজি না কেন? যখন আশা নাই, এ ছার জীবনভার বহিয়া আর কাজ কি? তা বটে তবু মরিতে পারিলাম না। তার পর আরও কত দিন মনে করিয়াছি, পারি নাই। যখনই এ কল্পনা করি, তখনই স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়ে। একেই ত নিরন্তর কেবল আপনার ভাবনা ভাবিয়া পাপের ভরা ভারী হইয়াছে; ইহার উপর জননীর চক্ষে জল পড়িলে যে নরকেও স্থান হইবে না। শুদ্ধ কি এই জন্য? মরিতে যে পারি না, সে কি কেবল নরকের ভয়ে? তাহা নয়! যার মনের ভিতর [illegible] নরকাগ্নি জ্বলিতেছে, তার আর নরকের ভয় কি? তাহা নয়। আজিও জগৎসংসারে একটা সুখ আছে—গৃহে গিয়া, মা বলিয়া ডাকিতে পাই; সব বন্ধন ছিঁড়িয়াছে—এ জন্মের শোধ সকল বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, ঐ

শুনিয়াছিলাম। টোড়ি রাগিণীর সে সময় নহে, কথা মধুর লাগিয়াছিল। দিনে বেহাগ গাইতে হয় না, রাত্রে ভৈরবী গাইতে হয় না, এ সকল কথার অর্থ, আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সময় বিশেষে রাগিণীবিশেষ শুনিতে যে বড় মিষ্ট লাগে, তাহা বুঝি; কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সময়ে মিষ্ট লাগিবে না, এমন কি শাস্ত্রে আছে?

এক বন্ধন আছে। একবার যে মা বলিয়া ডাকিতে পাই, সেই সুখে এতদিনও এ রাবণের চিতা বুকে করিয়া আছি। রোগে হোক্, শোকে হোক্, দুঃখে হোক্, বিপদে হোক্, মা বলিয়া ডাকিলে যেন সকল সন্তাপ দূরে যায়। আবার যেন বাল্যকাল ফিরিয়া পাই। আবার যেন সেই চিন্তা-শূন্য, সদানন্দচিত্ত অবোধ শিশু হইয়া দাঁড়াই। আবার যেন সেই সোহাগের অঞ্চল ধরিয়া স্নেহ-পূর্ণ মুখপানে চাহিয়া, নাচিয়া, নাচিয়া, সন্দেশ চাই—দে মা, দে মা। কেন দিবি না মা। বলিয়া আবার যেন অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করি, অঞ্চল ধরিয়া লুটাই। আবার যেন সংসার সুন্দর হইয়া উঠে, প্রকৃতির মুখে আহ্লাদ দেখি, আশা ফিরিয়া পাই। যে কখনও মা-মাখা মাতৃভাষায় মা বলিয়া ডাকে নাই, তার মনুষ্যজন্ম বৃথা, স্নেহের গভীরতা, মনুষ্যহৃদয়ের মধুরতা, স্ত্রীজাতির পবিত্রতা, কিছুই সে জানিল না। বন্ধু-বান্ধবে স্নেহ করে, পুত্রকন্যায় স্নেহ করে, জীবনসহচরী স্ত্রী স্নেহ করেন ; কিন্তু মায়ের মতন অমন পবিত্র স্নেহ কে করে ? অত স্নেহ কার ? কিন্তু কেমন ভোলা মন, এক কথা বলিতে আর এক কথা আসিয়া পড়ে।

চিরকাল মনে সাধ—তুমি ভাল থাক, তুমি সুখে থাক, আর আমি যেন তোমার কাছে থাকি। তুমি সুখে থাক, আর দেখিবার জন্য আমি যেন তোমার কাছে থাকি। তোমার সুখে আমি সুখী এই কথা কানে কানে বলিবার জন্য, আমি

যেন তোমার কাছে থাকি। তুমি অবশ্য ভাল আছ, তুমি অবশ্য সুখে আছ, কেন না, তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে কেহ কোনও কালে দুঃখের বার্ত্তা জানে না; অথবা জানে কি না, তাহা আমরা জানি না—কেন না, সে অপরিজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত দেশে যে একবার যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। * কিন্তু দুঃখ এই যে, আমি তোমার কাছে থাকিতে পারিলাম না। আরও দুঃখ এই যে; তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইল।

হায়! আমি মানব হইয়াছিলাম কেন? সে মানবী হইয়াছিল কেন? এই সরোবর-তীরে দুইজনে তরু হইলাম না কেন? উভয়ের ভাবে উভয়ে বিভোর হইয়া, পাতায় পাতা লাগাইয়া, শাখায় শাখা জড়াইয়া, উভয়ের স্কন্ধে উভয়ের মস্তক রাখিয়া, নির্জ্জনে ঢলাঢলি করিতাম। উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া, দুলিয়া দুলিয়া সরোবরের স্বচ্ছ জলে একশতবার উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতাম। আমার মুখ-প্রতিবিম্ব তুমি দেখিতে, তোমার মুখ-প্রতিবিম্ব আমি দেখিতাম, আর দুলিতাম। আমার নব-বিকশিত প্রসূন-নিচয়ে, দিবসে সূর্য্য-রশ্মির সুবর্ণসূত্রে, রজনীতে শশাঙ্কের রজত-তারে, মালা গাঁথিয়া তোমার কবরীতে

* "The undiscovered country, from whose bourne no traveller returns."

—Shakespear, *Hamlet's Soliloquy.*

পরাইতাম, আর মস্তক বাড়াইয়া দিয়া তোমার কুসুমহার আপন কণ্ঠে পরিতাম। তোমার সৌন্দর্য্যে আপনি সাজিয়া, আমার সাজে তোমায় সাজাইয়া, উভয়ে উভয়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া প্রেমের ছড়াছড়ি করিতাম। পূর্ণিমার রাত্রে, জ্যোৎস্না ধরিয়া দুই জনে জ্যোৎস্না-ক্রীড়া করিতাম—মুষ্টি মুষ্টি জ্যোৎস্না ধরিয়া হাসিতে হাসিতে আমি ফেলিয়া দিতাম, হাসিতে হাসিতে তুমি লুফিয়া লইতে; আবার ততোঽধিক হাসিতে হাসিতে তুমি ফেলিয়া দিতে, ততোঽধিক হাসিতে হাসিতে আমি ধরিয়া লইতাম। শশিহীনা নিশায়, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, হীরক-খচিত নীলচন্দ্রাতপতলে,মানসে সুখস্মৃতির ন্যায়,সুখস্বপ্নের ন্যায়,সুখস্বপ্নে তোমার এই চাঁদমুখখানির ন্যায়,আলোকের আবরণে মুখ ঢাকিয়া ভাবাবেগে, সুখাতিশয্যে, চক্ষু মুদিয়া, নিস্পন্দ হইয়া, দুই জনে বসিয়া থাকিতাম। এত উল্লাসে, এত আনন্দে, এত সুখে, কানের গোড়ায় পাপ সমীরণ যদি হায় হায় করিতে আসিত—এ কথা বলিতেছি, কেন না সংসারে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। এই জগৎপদ্ধতি, যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে—সেই দেখিতে পারে না, আর কে দেখিতে পারিবে? এ দুরন্ত নিয়ম যদি কোনও চেতনসত্ত্বা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে—কথাটা নিতান্ত হাসিবার নয়; জগতে যে চৈতন্য আছে, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যদি সন্দেহ কর ত ঐ সন্দেহই কথার প্রমাণ। তবে সেই চৈতন্যের ভৌতিক সংযোগোৎপন্ন-

তার, আণবিক গত্যেকত্বের অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যতক্ষণ দিতে পারা না যায়, ততক্ষণ প্রকৃতিনিরপেক্ষ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করাই বিজ্ঞানানুমোদিত; তবে সেই চৈতন্যের সৃষ্টি-কর্তৃত্বে অবশ্য সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্য যে আছে, তাহা ত আর পরকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, তাহাতে ত আর সন্দেহ হইতে পারে না; সুতরাং চৈতন্য আছে, ইহা মানিলে তাহাতে দোষ নাই। এখন এ নিয়মে যদি কোন সচেতন সত্তায় প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সেই দেখিতে পারে না, ত আর কে পারিবে? তাই মনের দুঃখে বলিতেছিলাম, এত সুখের সময়, এমন অমৃত-হ্রদে অবগাহনের সময়, পবন আসিয়া যদি গাইত—হায় হায়, তবেই দুই জনে মাথা দোলাইয়া এক তালে, এক সুরে, এক রাগিণীতে, সাধা গলায়, গলায় গলা মিশাইয়া দুই গলায় এক করিয়া, সভ্রূভঙ্গে বলিতাম—সব, সব, সব—এত সুখে, এত উৎসবে, এত আনন্দে, পোড়া মুখে হায় হায় বৈ আর কথা নাই—দূর, দূর, দূর! কিন্তু এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, এত সুখ এ পোড়া অদৃষ্টে হইবে।

এ সংসারে, কে কেমন অদৃষ্ট লইয়া আইসে, কিছুই বুঝা যায় না! সুখে, সকলেরই সমান দাবি; কিন্তু যেমন নন্দ-কুমারের মহোৎসবে, তেমনি সংসারে—কেহ মৎস্যের মুড়া পায়, কেহ বন্দুকের হুড়া খায়। সুখী একজনও নহে—ইনি প্রহার-বেদনায় কাতর, উনি পরিতৃপ্তি বৃশ্চিকদংশনে কাতর। সকলেরই

ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, কিন্তু যেখানে সকল পথ আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানে কেবল হাহাকার আছে, চ'ক্ষের জল আছে, আর হৃদয়ের শোণিত আছে! যে পথে যে যাও, একদিন না একদিন, সকলের এইখানে আসিতে হইবে। সকল অভিলাষের, সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল সাধের পরিণাম—কেবল হাহাকার। দেখ ভাই সকল, এ ছাইয়ের সংসারে কিছুতেই কিছু নাই। ধন বল, জন বল, সহায় বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, মর্য্যাদা বল, বিদ্যা বল, খ্যাতি বল সব মিথ্যা—মনের অনল কিছুতেই নিভে না। সুখতৃষ্ণায়, দূর হইতে যাহাকে স্বচ্ছ সরোবর বলিয়া বোধ হয়, অগ্রসর হইয়া দেখি, সে সরোবর নহে—সংসার মরুভূমিতে কল্পনারশ্মি-সম্ভূত মরীচিকা মাত্র। ওই দুঃখেই ত—

"হিয়ার ভিতরে লুটায়ে লুটায়ে
কাতর পরাণ কাঁদে।"

ইতি ষষ্ঠ প্রস্তাব।

শয়ন-মন্দিরে

সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই। এই মহাশ্মশান এক দিন প্রমোদোদ্যান ছিল। নীলাকাশে যেমন শরতের চাঁদ, জাহ্নবীর জলে যেমন বসন্তের বনশোভা, রমণীর অধরে মধুর হাসি, রমণীর কণ্ঠে যেমন প্রণয়ের কথা, সংসার মধ্যে এই মন্দির একদিন তেমনি ছিল। এইখানে একদিন কত সুখের ঢেউ, কত আনন্দের লহরী যে উঠিয়াছে, সে কথা আর পাড়িয়া কাজ কি?

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ সংসারকে অমরাবতী বলিয়া বোধ হইত। এই গৃহ, সেই অমরাবতীতে যেন নন্দন-কাননতুল্য ছিল। সেই নন্দনকাননে একটি কল্পদ্রুম প্রস্ফুটিত পারিজাত আবৃত হইয়া, অন্তর বাহির আলোকিত করিয়া বিরাজিত ছিল। আর আমি অধমাধম, সেই পারিজাতসৌরভে বিভোর হইয়াছিলাম। সেই নন্দনকানন, সেই সুখকুঞ্জ এখন আমার অরণ্য হইয়াছে। যাহাকে লইয়া গৃহ, সে নাই—গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছে। এই অরণ্যে আমি সন্ন্যাসী—কি তপ তপি, কি জপ জপি, তাহা আর বলিয়া কি করিব?

আমার হৃদয়, কুসুমে কুসুমে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, গগনে গগনে, শ্মশানে শ্মশানে, ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—কি, তাহা বলিয়া আর কি হইবে? আমি জানি, আমার মন জানে, আর যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন—বলিয়া আর কি করিব? আমার মন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। আর কিছুতেই মন নাই। সকল বিষয়েই ছিল; এখন কিছুতেই নাই। মনে যে সকল উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা মনেই বিলীন হইয়া গিয়াছে! অন্তরে যে সকল সাধ ছিল, সে সকল অন্তরের তাপে গলিয়া গিয়াছে। আশা করিতে যে না পারি, তাহা নহে। আমি যে মূর্খ, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু সংসারে দেখিতেছি, আমার অপেক্ষাও মহামূর্খ অনেকে প্রতিপন্ন হইতেছে। আশা করিতে যে না পারি, তাহা নহে; কিন্তু আশা করিতে আর ইচ্ছা হয় না, আশা করিতে আর ভাল লাগে না। প্রতিপন্ন হইয়া কি হইবে! প্রতিপত্তি লইয়া কি করিব? দেখিবে কে? দেখাইব কাহাকে যাহার ভাগ লইতে কেহ নাই, তাহাতে প্রয়োজন? ধনোপার্জ্জন করিব কাহার জন্য? জ্ঞানবৃদ্ধি করিব কাহার জন্য? যশোলাভ করিব কাহার জন্য? সংসারধর্ম্ম করিব কাহার জন্য? কে আছে আমার? এ জগৎ-সংসারে আর কে আছে আমার? আমি একা। এ বিপুল সংসারে, এ অসীম জীবসমাকীর্ণ অনন্ত জগতে আমার বলিতে আর কেহ নাই। সে জন্য আর কিছুতেই মন নাই। এখন মন আছে, কেবল মৃত্যুতে। কিন্তু

মৃত্যুতেই যার মঙ্গল, তার মৃত্যু হয় না। যে ভাল, সে চলিয়া যায়; যে মন্দ, সে পড়িয়া থাকে। যে মরিলে দশজন কাঁদিবে, সে চলিয়া যায়; যার জন্য কেহ কাঁদিতে নাই, সে মরেও না। কিন্তু কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম—

আমার গৃহ নাই। সংসার খুঁজিলাম; কিন্তু যাহাকে লোকে গৃহ বলে, তাহা ত কৈ দেখি না। যেখানে সেখানে থাকিলেও যেখানে মন পড়িয়া থাকে, অন্যত্র স্বর্গসুখে থাকিলেও যেখানে যাইবার জন্য প্রাণ কাঁদে, এ সংসারে যে স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও বড়—আমার তেমন স্থান ত কৈ দেখি না। যেখানে গেলে শোকতাপ যায়, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখের শেষ হয়, সকল আপদের শান্তি হয়, সকল রোগ উপশমিত হয়, সকল অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, সকল অনল নির্ব্বাপিত হয়; যেখানে চির-বসন্ত বিরাজিত, চিরপ্রেম-প্রবাহিণী প্রবাহিত—আমার তেমন স্থান ত কৈ দেখি না! হায়! কি ছিল আর কি হইল? পূর্ব্বে যে কোন দুঃখ ছিল না, এমন কথা কে বলিতেছে? দুঃখ থাকিবে না কেন—এ মনুষ্যজন্মই দুঃখভোগের জন্য। দুঃখ ছিল বৈ কি। দুঃখ চিরকালই আছে। শৈশবাবস্থাতেও ছিল। কত দিন, মাতার ক্রোড় হইতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চারিত করিয়া, আকাশের চাঁদকে ডাকিতাম। মনুষ্য-হৃদয় চিরকাল সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল; বয়সে রুচিপরিবর্ত্তন হয়। তখন চাঁদকেই সর্ব্বাপেক্ষা

সুন্দর বলিয়া জানিতাম। তদপেক্ষা সুন্দর পদার্থও যে সংসারে আছে, তাহা পরে দেখিলাম। হস্ত নাড়িয়া, আয় আয় করিয়া, আকাশের চাঁদকে ডাকিতাম। এ সংসারে সকল ডাক যে শ্রুত হয় না, তাহা ত কখনও জানিতাম না—ডাকিয়া মনে করিতাম আসিতেছে। আনন্দে মাতার ক্রোড়ে বসিয়া বসিয়াই নাচিতাম —মহানন্দে দুই হাতে আপনার পেট চাপড়াইতাম, জননীর মুখ চাপড়াইতাম, চুল ধরিয়া টানিতাম, মুখ চাপিয়া ধরিতাম। তার পর ফিরিয়া দেখিতাম, চাঁদ আসে নাই, আসিতেছে না, বুঝি আসিল না। তখন আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দু'খানি দিয়া জননীর হাত ধরিয়া, সেই হাত দোলাইয়া ডাকিতাম, তবু আসিত না। মা ডাকিতেন, তবু আসিত না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। দুঃখ ছিল না, কে বলিতেছে ? কত দিন পোষা বিড়ালটার সঙ্গে খেলা করিতে যাইতাম ; খেলিত না। বসিবার জন্য কত অনুরোধ করিতাম ; অনুরোধ শুনিত না। লেজ ধরিয়া টানিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতাম, তবু ম্যাও ম্যাও করিয়া চলিয়া যাইত—দুঃখ ছিল না, কে বলিতেছে ? তণ্ডুল-কণার লোভে কত দিন কত সুন্দর পাখী আসিত, খেলিবার আশায় নিকটে যাইতাম উড়িয়া পলাইত ; কত দিন আপন মনে দেখিতাম—মা আসিয়া কোলে তুলিয়া খেলা ভাঙ্গিয়া দিতেন—দুঃখ ছিল না, কে বলিতেছে ? দুঃখ ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত। কিন্তু সে নিশ্বাসে আর এখনকার নিশ্বাসে অনেক

প্রভেদ। তখন একটা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া যাইত; এখন একটা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, এক ঝলক করিয়া রক্ত শুকাইয়া যায়, হৃদয়যন্ত্রের একটা করিয়া তার ছিঁড়িয়া যায়, সংসারবন্ধনের একটা করিয়া গ্রন্থি খুলিয়া যায়। সে কালের দীর্ঘনিশ্বাস এমন করিয়া শোণিত পান করিত না।* দুঃখ ছিল না, কে বলিতেছে? দুঃখ ছিল; কিন্তু মরণ হয় না কেন, ইহা বলিয়া কখনও দুঃখ করিতে হয় নাই।

সে দুঃখ গেল—এখন মনে করি, সে সুখ গেল—সে দুঃখ গেল; আবার নূতন দুঃখের সৃষ্টি হইল। এ নূতন দুঃখ যে কে আনিল, সে দারুণ কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। যেই আনুক, তখনও দুঃখ ছিল! দেখিবার সময় চক্ষে পলক পড়ে কেন, এই এক দুঃখ। বিদেশে যাইতে হয় কেন, এই এক দুঃখ। বিদেশ হইতে যখন গৃহে ফিরিয়া যাই, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে কেন, এই এক দুঃখ। আরও কত দুঃখ ছিল। মানুষের পাখা নাই কেন

* "All fanceseick she is, and pale of cheer.
With sighs of love that cost the fresh blood dear."
Midsummer Night's Dream.

Again :—
"Might liquid tears, or hearting-offending groans,
Or blood consuming sighs, recall his life,
I would be blind with weeping, sick with groans
Look pale as primrose with blood-drinking sighs."
—*Henry VI.*

—স্পর্শ, ত্বকের উপর না হইয়া, বুকের ভিতর হয় না কেন —যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায় না—আরও কত দুঃখ ছিল। সে দুঃখও গেল—কিছুই চিরদিন থাকে না। সবই যায়; তবে প্রভেদ এই যে, যার অদৃষ্ট ভাল, তার একটি একটি করিয়া যায়, রহিয়া সহিয়া যায়; আর আমার মতন যার অদৃষ্ট, তার এক দিনে, এক সঙ্গে, এক মুহূর্ত্তে, এক নিমেষের মধ্যে ভাসিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে আশার বাসা, সুখের মন্দির, প্রফুল্লতার ক্রীড়াভূমি জীবনলতার আশ্রয়-তরু, প্রকৃতির রম্যতম চিত্র, প্রাণের অধিক—তদপেক্ষা অধিক ধন, সব বাতাসে গলিয়া যায়। সে সুখের দুঃখও গেল! হায়! সে দুঃখ গেল কেন? গেল ত আমি থাকিলাম কেন? সে দুঃখ গেল; আবার নূতন দুঃখের সৃষ্টি হইল। এ নূতন দুঃখ যে কেমন, তাহা এই বুক চিরিয়া দেখ দুঃখ ছিল না, কে বলিতেছে? দুঃখ ছিল; কিন্তু হৃদয়কে এমন করিয়া ত অবসাদ-হ্রদে ডুবাইয়া ধরিত না—বিষাদ-সাগরের উপর স্থির রাখিয়া, ভিতরে ভিতরে এমন তরঙ্গ ত তুলিত না!

মানুষের ছার প্রাণ সব সহে। শক্তি অবস্থাগত, অবস্থা শক্তিগত নহে। যে মুখ মলিন দেখিলে এক দিন দশদিক শূন্য বোধ হইয়াছে, সে মুখ না দেখিয়াও ত প্রাণ ধরিয়া আছি। এক দণ্ড যে চ'ক্ষের আড় হইলে ধড়ে আর প্রাণ থাকে নাই, সে যে চিরদিনের মতন চ'ক্ষের বাহির হইল, তাহাও প্রাণে সহিল!

সেই অমূল্য-নিধিতেই যদি বঞ্চিত হইলাম, তবে কিসের জন্য প্রাণ, কিসের জন্য সংসার, কিসের জন্য এই ছার গৃহ? হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বসিয়া, সেই রূপ ধ্যান করিয়া, সেই নাম জপ করিয়া, এ জীবন অতিবাহিত করি না কেন? এ জগতে আমার আশাপথ চাহিতে আর কেহ নাই—আমার ন্যায় দুঃখী কে? আমাকে আসিতে দেখিলে, আর কার উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইবে? আর কার মধুর অধরে মধুর হাসি খেলিতে দেখিলে, বুকের ভিতর জ্যোৎস্না ফুটিবে—বুকের ভিতর বসন্ত-সমীরণ বহিবে? আর কার কণ্ঠস্বর শুনিলে, ভূত ভবিষ্যৎ মুছিয়া যাইবে? আর কার মুখে, সেই পচা, বস্তা-পচা, খস্‌খসে—তাহাতে সার পদার্থ নাই—কার মুখে, সেই নূতন, চির নূতন, যখনই শুনা যায়, তখনই নূতন; কত বার, কত দিন—প্রায় নিতুই শুনিতাম, নিতুই নূতন লাগিত—সেই পুরাতন-নূতন, সেই আহা-ছি-ছি—'এক রাজা থাকেন, তাঁর দুই রাণীর' কাহিনী, আর কার মুখে শুনিলে, এই ছাইয়ের সংসার সোণার বলিয়া বোধ হইবে? বালাই লইয়া মরি! কেমন যে ভঙ্গী, কেমন যে বক্তা, কেমন যে কণ্ঠ, কেমন যে শব্দসাগরের বাছা বাছা শব্দরত্নগুলি, কেমন যে মধুর গাম্ভীর্য্য, কেমন যে কি-জানি-কি, সেই মুখে সেই কাহিনী শুনিয়া, বক্তার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে সাধ যাইত। সেই কাহিনী তাহার পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছি, বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু

তাহার মুখে শুনিলে, প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক মাত্রাটি পর্য্যন্ত যেন হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিত। সেই কাহিনীতে বিশেষ কবিত্বের পরিচয় কিছু ছিল না, কিন্তু কি এক গুণ ছিল, তাহা কবিত্বেও দেখিতে পাই না, কিছুতেই দেখিতে পাই নাই। তাহাতে কেমন এক মাধুরী ছিল, সে মাধুরী চন্দ্রকরলেখায় নাই, বসন্তপবনে নাই, নদীপার-সমাগত প্রেম-সঙ্গীতে নাই, কুমারসম্ভবের তৃতীয় স্বর্গে নাই, মহাশ্বেতার প্রণয়ে নাই—সংসারের কোথাও সে মাধুরী দেখিতে পাই না। তাহা শুনিতে কেমন আনন্দই যে হইত, তেমন আনন্দ বিষবৃক্ষ পড়িয়া হয় নাই, আইভান্‌-হো পড়িয়া হয় নাই, করসেয়ার পড়িয়া হয় নাই, অন্নদামঙ্গল পড়িয়া হয় নাই, সিড পড়িয়া হয় নাই, রোমীয়ো এবং জুলিয়েট্‌ পড়িয়া হয় নাই, রঘুবংশ পড়িয়া হয় নাই, রামায়ণ পড়িয়া হয় নাই। যেমন রমণীয় হৃদয়—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, কাহিনীও তেমনি। ইহাতে সামান্য কীর্ত্তি, রাক্ষস-বধ; সামান্য প্রণয়, প্রাণপণ; সামান্য লাভ, বিপুল রাজ্য; সামান্য দান, অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং এক রাজকন্যা। বলিয়াছি ত, তাহাতে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ছিল না—সবই ভয়ানক, সবই আশ্চর্য্য। সেই এক ভাব! সকলগুলিতেই রাজপুত্র আছে; সকলগুলিতেই রাজকন্যা আছে; সকল-গুলিতেই রাজপুত্র এবং রাজকন্যার প্রণয় হয়; সকলগুলিতেই প্রণয়ের জয়। সকল নায়িকাই রূপবতী—কেহ ঘর আলো

করেন, কাহারও হাসিতে মাণিক ঝরে, কাঁদিতে মুক্তা পড়ে। সেই ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী পাখী, সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া, সেই তাল-পত্রের খাঁড়া, সেই রাক্ষস, মানবের সহিত পরীর প্রণয়, সেই বরপ্রার্থনা, সেই অভিশাপ, সেই স্বর্গের রথে চড়িয়া দেব-কন্যাদিগের স্নান করিতে আগমন, সেই পাতালে বাস, সেই বিকটাকার দৈত্য, সেই মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি, সেই বিলাস-বতী মালিনী, সেই অসংখ্য রাজপুত্রের গাড়লত্ব প্রাপ্তি—সেই সব। যেখানে রাজা মরে, সেইখানেই রাজহস্তী পাগল হয়। যেখানে দুই রাণী সেইখানেই ছোটটি সুয়া, বড়টি দুয়া ; সেই-খানেই ছোটটি ভাল বড়টি মন্দ। যেখানে রাজার কুবুদ্ধি ঘটে, সেইখানেই হাতীশালে হাতী মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে ! যেখানে স্ত্রীলোকের অপমান, স্ত্রীলোকের মনঃপীড়া, সেই রাজ্যই উচ্ছন্ন যায়। বলিয়াছি ত, সেই একই কাহিনী নূতন নূতন সংস্করণ মাত্র। হুঁটি পর্য্যন্ত তেমনি করিয়া দিতে হয়। কিন্তু উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট চন্দ্রকরলেখায় শয়ন করিয়া, সেই কাহিনী শুনায় যে সুখ, তেমন সুখ, এ ছার জগতে কোথায় আছে? সেই চাঁদমুখে ঐ কাহিনী শুনিতে শুনিতে মনে করিতাম—আলিঙ্গনটা, শরীরে শরীরে না হইয়া প্রাণে প্রাণে হয় না কেন? প্রাণের ভিতর হাত বাহির করিয়া, তাহার প্রাণকে আদর করিতে পাই না কেন? সেই কাহিনী-প্রস্রবণ যে দিন শুকাইয়াছে, সেই দিন হইতেই ত এমন হইয়াছি—

কি যে পাগলের মতন আবল তাবল বকি, তার ঠিকানা পাই না! সেই দিন মনের প্রধান বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে—মন যেন সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, শূন্যের উপর যেন হেলিয়া পড়িয়াছে। সেই দিন হইতে কেমন যে হইয়া গিয়াছি, একটা মধুর শব্দ কোথাও শুনিলেই, একটা সুন্দর কিছু দেখিলেই, প্রাণ উদাস হইয়া যায়—শূন্যময়, পৃথিবীময়, আকাশময়, জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে—কাহার সন্ধানে, তাহা আর কি বলিব? যাহার সন্ধানে, তাহাকে কে খুঁজিয়া দিবে? কিন্তু—

সেই মুখে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া, সেই মুখের লাবণ্যলীলা দেখিতে দেখিতে, সেই মুখের কাহিনী শুনায় যে সুখ, তেমন সুখ স্বর্গেও নাই। তার প্রত্যেক বাক্যের বিনিময়ে এক একটা সৌরজগৎ দিলেও উপযুক্ত প্রতিদান হয় না—এক একটা মানসিক বৃত্তি ছিঁড়িয়া দিলেও উপযুক্ত মূল্য হয় না। কিন্তু এত যে সুখ তাহার মধ্যে দুঃখ আসিয়া জুটিত। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইত না। প্রদীপটা—প্রদীপের কপালে আগুন! প্রদীপটা আমার পশ্চাতে থাকিলে, আমার মুখের ছায়া তাহার মুখে পড়িত; তাহার পশ্চাতে থাকিলে, তাহার মুখে আলোক পড়িত না। এই দেখ জগৎপদ্ধতির একটা অসম্পূর্ণতা। কোম্‌ত যে জগৎ-পদ্ধতিকে দোষারোপ করিয়াছেন, জগৎ-পদ্ধতিকে অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন, সে কথা প্রামাণিক—সে কথা খাঁটি। আমরা যেমন হইয়া থাকি, আলোকটা

প্রতিনিয়ত তাহারই মুখের উপর পড়ে না কেন? জগৎ-পদ্ধতিতে দোষ নাই, এ কথা কে বলিবে? এ বিশ্বরচনার আর একটা দোষ এই যে, সকল বিষয়ের চরিতার্থতা, সকল কার্য্যের সার্থকতা হয় না! ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল. কেবল আমি বলিয়া নয়—ভালবাসিয়া কয়জন সুখী হইয়াছে? কে কাঁদে নাই? কে অদৃষ্টকে মন্দ বলে নাই? কে বুকে করিয়া নরক বহে নাই? কত কাল কাঁদিতেছি, কত কাল কাঁদিতে হইবে! এ পাপ-চক্ষে কত জলই যে আছে, তা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু কাঁদ, চিরকাল কাঁদিয়া মর—কান্নার পরিণাম কান্না বৈ আর কিছুই নাই। তাহাতেই বলি, জগৎ-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ। ইহাতে ঈশ্বরের উপর দোষ পড়ে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর যে কেমন, ঈশ্বর যে কি, তাহা তুমি আমি কি বুঝিব ভাই? * সকল অপেক্ষা যে † অধিক জানিত, সে কিছুই জানে না! নিউটন জানিতেন যে, জ্ঞান-মহার্ণবের কূলে, তিনি উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছেন মাত্র। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তুমি আমি কি জানি ভাই? এই ছার হৃদয়টুকুর সব কথা পরিষ্কার করিয়া জানিতে পারি না—জগৎ-কারণের প্রকৃতি সম্বন্ধে, তুমি আমি কি জানি ভাই? যদি কিছু জানি,

---

* যে মনে করে, আমি ঈশ্বরকে জানিয়াছি, সে কিছুই জানে নাই। যে তাঁহাকে জ্ঞানাতীত মনে করে, সেই তাঁহাকে জানিয়াছে। —তলবকারোপনিষৎ

† Socrates knew that he knew nothing.

ত সে এই মাত্র যে, তাহা অজ্ঞেয়! কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি—

কি ছিল, আর কি হইল! একজনের অভাবে যে সব ফুরায়—আশা, ভরসা, সুখ, সব ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা কে জানিত? তাহাকে হারাইলে যে সংসার অন্ধকারময় হইবে, তাহা জানিতাম; কিন্তু এমন যে হইবে, তা কার মনে ছিল? সে যে কি ধন, তা আর কি বলিব? যেন লজ্জাবতী লতা—আদর-সংস্পর্শেও সঙ্কুচিতা। কার কেমন রুচি, বলিতে পারি না—পরচিত্ত অন্ধকার; কিন্তু লজ্জাই ত স্ত্রী-চরিত্রের কুহক। যে লজ্জাশীলা, তাহাকে বুক চিরিয়া রাখিতে পারি; আর যার লজ্জা নাই, সে—কিন্তু পাপমুখে মন্দ কথা আসিতেছিল বুঝি। লজ্জাই ত প্রণয়ের ভেল্কি; প্রেম পুরাতন হয় না। লজ্জানম্র দেখিলেই যে প্রেম আবার নবীন হইয়া উঠে। ঘোম্‌টা টানিতে দেখিলেই বোধ হয় যেন, এই আজ কাল ভালবাসা-বাসি হইয়াছে। লজ্জা না থাকিলে প্রেমের নবীনত্ব থাকে না—সেই 'নিতুই নব' ভাব থাকে না—সেই 'যখন-হেরি-তখনি-নব' ভাব থাকে না। অশুভক্ষণে বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্ত্রীচরিত্রের এই কুহক ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিতেছি। *

* আমার স্মরণ হইতেছে, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বিনোদিনী পত্রিকা"র কোন এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—"রসিক পবন, যুবতীর বুকের বসনের মধ্যে ঢুকিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে।" স্ত্রীলোকের পত্রিকায় এরূপ অপূর্ব্ব ভাবের সন্নিবেশ

আমি বলি কি, স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়ার পরিবর্ত্তে সঙ্গীতবিদ্যা শিখাইলে কেমন হয়? ইহাতে সুখের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরেজি শিক্ষার একটি কুফল এই ফলিয়াছে যে, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ অতি অল্পই দেখা যায়। যাঁহারা মনে করেন, সঙ্গীতানুশীলনে লোক বিলাসপ্রিয়, নিরুৎসাহ, আগ্রহশূন্য ভীরু হইয়া পড়ে, তাঁহারা ভ্রান্ত! কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন জাতিই বোধ হয়, জার্ম্মাণদিগকে ন্যায় সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করে নাই; তাহাদের বীর্য্য হ্রাস হওয়া দূরে থাক্, সে দিন তাহারা বিলক্ষণ বীর্য্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। সঙ্গীতে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করে, নিষ্ঠুরতা হ্রাস করে, মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করে। * কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

দেখিলে আমরা দুঃখিত হই, আমরা স্তম্ভিত হই—"অপরং বা কিং ভবিষ্যতি"—এই ভাবিয়া ভীত হই।

* Polybius, the judicious Polybius tells us that music was necessary to soften the manners of the Arcadians who dwelt in a country where the atmosphere was bitter and cold; that the inhabitants of Cynothœ, who neglected the study of music, surpassed all Greeks in cruelty, and that city was the scene of the most terrible crimes. Plato does not hesitate to say that a change in music betokens a change in the constitution of the state, and Aristotle although he seems to have written his work on Politics with the express intention of opposing the opinion of Plato agrees with him on this subject. Theophrastus, Plutarch, Strabo, and all the ancients thought the same.

See *Montespuieu : Esprit des Lois. Book. IV. Ch. VIII.*

সে যে কি ধন, তাহা আর কি বলিব? যেন নব-কুসুমিতা লতা—আপন সৌন্দর্য্যভারে আপনি বিব্রত; যেন শ্রাবণের নদী—আপন লাবণ্যে আপনি মুগ্ধ; যেন নব-বিকশিত যূথিকা—আপন সৌকুমার্য্যে আপনি কাতর, আপন পবিত্রতায় আপনি বিভোর! কিন্তু হায় রে দশা! যত দিন সে ছিল, তত দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। এখন যাই সংসার শূন্য হইয়াছে, দশদিক্ অন্ধকার হইয়াছে, গৃহ অরণ্য হইয়াছে, মন উড়ু উড়ু হইয়াছে, হৃদয় অবলম্বনশূন্য হইয়াছে, তাই তার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। এত দিনে তাহাকে চিনিয়াছি। মানুষ যত দিন থাকে, তার মর্ম্ম কেহ বুঝে না। কবিগুরু হোমর এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন—আজ সাতটা স্থান তাহার জন্মভূমিত্বের দাবী করিতেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মরিলেন—আজ বঙ্গভূমি তাহার জন্য কাঁদিতেছে। লর্ড বাইরণ অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া, স্বদেশ-বহিষ্কৃত হইয়া, দূরদেশে মিসলিংহিতে প্রাণত্যাগ করিলেন—আজ পার্লামেণ্টে তাঁহার স্মরণস্তম্ভ সংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। জিনিস যতদিন থাকে, তত দিন তার আদর হয় না। তখন মনে হইত, বুঝি চিরদিনই এমনি যাইবে। মনে করিতাম, এ প্রণয়ের বুঝি বিচ্ছেদ হইবে না। মনের কেমন একটা স্বভাব, যাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা থাকে, যাহা বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে, যাহা বিশ্বাস করায় সুখ আছে, তাহা সহজেই বিশ্বাস করে। উহা

বিশ্বাস করাই আমার গরজ—সে না থাকিলে যে জীবন অন্ধকার হইবে ; বিশ্বাস করাই আমার গরজ। গরজের আইন নাই। অকস্মাৎ এক দিন, আমার বড় সাধের বিশ্বাসে ছাই পড়িল। সেই দিন হৃদয়ের "পাঁজর ধ্বসিয়া গেল"। সেই দিন হইতে আমার এ হৃদয়, আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না—তুলিব তুলিব মনে করে, তুলিতে পারে না, মাথা লুটাইয়া পড়ে। প্রভঞ্জন-সন্তাড়িত বংশবৃক্ষের ন্যায় মাথা তুলিব তুলিব মনে করে, তুলিতে পারে না—উঠিতে উঠিতে আবার লুটাইয়া পড়ে। নদীহৃদয়ে মন্দসমীরণোত্থিত ক্ষুদ্র বীচির ন্যায়, মাথা তুলিয়া অমনি ঢলিয়া পড়ে। সুন্দর কিছু অনুভব করিলেই, পোড়া প্রাণ অমনি, অতীতের অগ্নিময় গর্ভে মুখ গুঁজিয়া নাতান হইয়া পড়ে? কেমন যেন উদাসীন হইয়া গিয়াছি। জীবন ধরিয়া থাকিলে সকল কার্য্য করিতে হয়। সকল কার্য্যই করি ; কিন্তু যেন না করিলে নয় বলিয়া। এ হৃদয় সমাধিক্ষেত্র হইয়াছে—সুখের সমাধি, আশার সমাধি, প্রফুল্লতার সমাধি, উৎসাহের সমাধি, প্রণয়ের সমাধি—যাহা কিছুকে লোকে জীবন বলে, চৈতন্য ব্যতীত সে সকলের সমাধি। কত ভাব মনে উদয় হয়, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করে না—হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। কেবল এক ভাব জাগিয়া রহিয়াছে। মধ্যসময়ে পোপ-সাম্রাজ্য যেমন রোম-সাম্রাজ্যের প্রেতাত্মার ন্যায়, রোম-সাম্রাজ্যের সমাধির উপর বসিয়াছিল

আমার হৃদয়ে, ভাবের সমাধির উপর, ভাবের প্রেতমূর্ত্তি তেমনি সমাধি জুড়িয়া বসিয়া আছে। * এত দিন যে দেখি নাই, তবু—

"সে চাঁদমুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে ;"

এই শয়ন-মন্দির—বলিয়াছি ত এক দিন বড় সুখের স্থান ছিল। আজই যেন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি ; চিরকালই কিছু এমন ছিলাম না। এক দিন, এইখানে আসিতে হইলে ভূত ভবিষ্যৎ মুছিয়া যাইত, ভাবে ঢল ঢল হইয়া গলিয়া যাইতাম—আমাতে আর আমি থাকিতাম না ; আর আজ কিনা, সেই স্থানে আসিতে ভয় হইতেছিল। ভয় হইতেছিল—

"কৈছনে যায়ব যমুনাতীর।
কৈছ নেহারব কুঞ্জকুটীর॥"

কি যে ছিল, তাহা আর কি বলিব ? সে অনলে ঘৃতাহুতি দিয়া আর কি লাভ ? কি যেন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি ! গৃহ আর যেন গৃহ নাই। দীনবন্ধো ! এ কি করিয়াছ ? বিগ্রহ-শূন্য মন্দিরের ন্যায়, বিসর্জ্জিত প্রতিমার পাটের ন্যায়, জীবশূন্য জনপদের ন্যায়, মধ্যাহ্ন-মরুভূমের ন্যায়, আমার হৃদয়ের ন্যায় গৃহ যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। গৃহদাহের ন্যায়, প্রাণাধিকার

* There is a belief among the vulgar in Europe that the ghosts of the dead haunt their graves.

চিতার ন্যায় যেন অন্তরে অন্তরে ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। যেন ঘোর নারকীয় নরকযন্ত্রণাসমুদ্ভূত আর্ত্তনাদের ব্যঙ্গ করিয়া, সহস্র সহস্র নারকী পিশাচ, বিকট দর্শন খুলিয়া, অট্ট অট্ট হাসিতেছে। সে গৃহ আমার কৈ? সেই যে দেখিলে গলিয়া যাইতাম, সে গৃহ এখন কৈ? এ আকাশে যে চাঁদ ছিল, সে চাঁদ আমার কৈ? এ সরোবরে যে প্রমোদতরণী ভাসিতেছিল, সেখানি আমার কৈ? হায় হরি! এ দশা কে করিল? এ দীনহীনের মাথা এমন করিয়া কে খাইল? এ কি হইয়াছে? সুখলতায় বজ্রাঘাত হইয়াছে—আছে, কিন্তু না থাকিলে যে ছিল ভাল। জননীর চক্ষের উপর যেন জননীর একমাত্র সন্তানকে ব্যাঘ্রে ধরিয়াছে—আছে, বাঁচিয়া আছে; কিন্তু অনাথনাথ! এ কি রকম থাকা? যেন আজীবনের সঞ্চিত ধন সিন্দুক ভাঙ্গিয়া কে চুরি করিয়াছে—হরি হরি! সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে! কুলক্রমাগত পৈতৃক বাসগৃহ পুড়িয়া গিয়াছে—পোড়া ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলাম কেন? দেখিবার পূর্ব্বে মরিলাম না কেন?

সবই আছে, কিন্তু সবই যেন চক্ষু মুদিয়া আছে—সবই যেন কাহার বিরহে বিষণ্ণ হইয়া আছে। সকল হইতেই কি একগুণ যেন উঠিয়া গিয়াছে, মুছিয়া গিয়াছে, ধুইয়া গিয়াছে—তাহার লেশমাত্রও নাই। তাহারই অভাবে সবই যেন কেমন হইয়া গিয়াছে—সবই যেন, না থাকিলে নয়

বলিয়া আছে—সবই যেন মৃত মানুষের প্রেতের ন্যায়, মানব-শূন্য গ্রামের ন্যায়, জলশূন্য সরোবরের ন্যায়, উৎসাহশূন্য হৃদয়ের ন্যায়, বিজয়াদশমীর চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায়—যেন—যেন—যেন গৃহিণীশূন্য গৃহের ন্যায়, সবই যেন মলিন, অবসন্ন নির্জীব, কাতর হইয়া পড়িয়া আছে। সেই সকল গৃহশোভার সামগ্রী, কেমনই করিয়া সাজান রহিয়াছে; কিন্তু—হা দগ্ধ অদৃষ্ট! হা নিদারুণ বিধি! তাহাতে সে সৌন্দর্য্য নাই, সে মধুরতা নাই, কমনীয়তা নাই, সে মনোহারিতা নাই, সে কুহক নাই, সে ভেল্কী নাই—বহুদীপসমুজ্জ্বল গৃহে, রমণীর মধুর-কণ্ঠ-নির্গত, কৃষ্ণ রাধিকার মধুর-প্রেমাত্মক মধুর সঙ্গীতের ন্যায় সে ভোর ভোর ভাব নাই—মধুর প্রভাত সময়ে, স্বপ্নশ্রুত, লোকান্তর-সমাগত, মৃদুবীণা-শব্দসঙ্গিনী কোমল স্বরলহরীর ন্যায় ভোর ভোর ভাব নাই—প্রাতে ভৈরবী রাগিণীর ন্যায়, শেষ-নিশার বিদায়ের গানের ন্যায়, নব-বসন্ত-সমাগমে মৃদুমন্দ নৈশসমীরে বিরহসঙ্গীতের ন্যায়, প্রণয়ীর প্রথম সপ্রেম আলিঙ্গনের প্রায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে বালিকার লজ্জারুদ্ধ প্রেমালাপের ন্যায়, সে ভোর ভোর ভাব নাই। সবই কেমন হইয়া গিয়াছে! আমিও কেমন হইয়া গিয়াছি! আছি, বাঁচিয়া আছি, কিন্তু কেমন হইয়া আছি।

ফলপুষ্পপত্র-শোভিত বৃক্ষে বজ্রাঘাত হইতে যেমন পত্র, ফল, পুষ্প, সব পুড়িয়া যায়, শাখা-প্রশাখা ছাই হইয়া উড়িয়া যায়, অথচ বৃক্ষ থাকে—পত্রহীন, পুষ্পহীন, শাখাহীন, শোভাহীন,

অগ্নিদগ্ধ শুষ্ক বৃক্ষ, পূর্ব্বের চিহ্নমাত্র যেমন দাঁড়াইয়া থাকে, এ অধমাধম তেমনি আছে।

মহাসাগরে অর্ণবযান প্রভঞ্জনাক্রান্ত হইলে, যেমন পাইল উড়িয়া যায়, হাল্ ছুটিয়া যায়, মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যায়, কেবল নিম্নভাগ মাত্র অনন্ত-শ্বেতনীলবিস্তৃতি মধ্যে তরঙ্গ-প্রতিঘাতে অথবা বায়ুমুখে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়—যাইবার পথ নাই, গতির উদ্দেশ্য নাই, ভাসিবার প্রয়োজন নাই, অথচ যেমন অকূল-সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়, আমি অধমাধম তেমনি আছি—

বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায়, প্রভঞ্জনবিধ্বস্ত অর্ণবপোতের ন্যায়, ভগ্নাবশেষ গৃহভিত্তির ন্যায়, ধ্বংসাবশেষ নগরের ন্যায় আমি আছি! এ পাপ জীবনের পঞ্চবিংশতি বর্ষ মাত্র যাইতেছে; আরও কতকাল যে এইরূপ থাকিতে হইবে, তা জগদীশ্বর জানেন!

"অব বিষ সম লাগয়ে মোই।
হরি হরি! পিরীতি না করে জনি কোই॥"

ইতি সপ্তম প্রস্তাব।

সম্পূর্ণ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা